ঝাউ বাংলোর রহস্য

ঝাউ-বাংলোর রহস্য



নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

বিচিত্রা
৬ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলকাতা-১২

'ঝাউ বাংলোর রহস্য' ধারাবাহিকভাবে 'সন্দেশ'এ বেরিয়েছিল। ছোটদের ভালো লেগেছিল জেনে, ভরসা করে বই আকারে ছেপে দিলাম। ভেতরকার ব্লকগুলি 'সন্দেশ' কর্তৃপক্ষ অনুগ্রহ করে ব্যবহার করতে দিয়েছেন। তাঁদের অকুণ্ঠ ধন্যবাদ জানাই।

১লা ফাল্গুন, ১৩৭০ — নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

শ্রদ্ধেয়া

শ্রীযুক্তা লীলা মজুমদার

করকমলেষু

॥ এক ॥

ঝমুরলাল চৌবে চক্রবর্তী

কথা ছিল আমরা পটলডাঙার চারজন—টেনিদা, হাবুল সেন, ক্যাবলা আর আমি শ্রীমান প্যালারাম, গরমের ছুটিতে দার্জিলিং বেড়াতে যাব। কলকাতায় একশো সাত ডিগ্রি গরম চলছে, দুপুর বেলা মোটর গাড়ির চাকার তলায় লেপটে যাচ্ছে গলে যাওয়া পিচ, বাতাসে আগুন ছুটছে। গরমের ধাক্কায় আমাদের পটলডাঙার গোপালের মতো সুবোধ কুকুরগুলো পর্যন্ত খেঁকি হয়ে উঠেছে। একটাকে তাক করে যেই আমের আঁটি ছুড়েছি, অমনি সেটা ঘ্যাঁক করে তেড়ে এল! আমের আঁটিটা একবার চাটা তো দূরে থাক, শুঁকে পর্যন্ত দেখলে না!

এরপর আর থাকা যায় কলকাতায়? তোমরাই বলো?



আমরা চারজনেই এখন সিটি কলেজে ফার্স্ট ইয়ারে পড়েছি, আর ছেলেমানুষ নই। তায় সামার ভ্যাকেশন। কাজেই বাড়ি থেকে পারমিশন পেতে দেরি হল না। খালি মেজদার বক-বকানিতেই কানের পোকা বেরিয়ে যাওয়ার জো! নতুন ডাক্তার হয়েছে—সব সময়ে তার বিদ্যে ফলানো চাই! আরো বিশেষ করে মেজদার ধারণা, আমি একটা জলজ্যান্ত হাসপাতাল। পৃথিবীর সমস্ত রোগের মূর্তিমান ডিপো হয়ে বসে আছি, তাই যত বিটকেল ওষুধ আমার গেলা দরকার। সারাদিন ধরে আমাকেই পুটুস পুটুস করে ইনজেকশন দিতে পারলে তবেই মেজদার আশা মেটে।

মেজদা বললে—যাচ্ছিস যা, কিন্তু খুব সাবধান! তোর তো খাবার জিনিস দেখলেই আর মাথা ঠিক থাকে না। সে চিনেবাদামই হোক আর ফাউল-কাটলেটই হোক। হুঁশিয়ার হয়ে খাবি, সিঞ্চল লেক থেকে দার্জিলিঙে যে জল আসে, সেটা এমনিতেই খারাপ, তার সংগে যদি যা-তা খাস, তাহলে স্রেফ হিল-ডাইরিয়া হয়ে বেঘোরে মারা যাবি।

এসব কথার জবাব দেবার কোনো মানে হয় না। আমি গোঁজ হয়ে রইলুম।

তারপরে বাবা আর মা-র উপদেশ, বড়দার শাসানি—লেখাপড়া শিকেয় তুলে দিয়ে একমাস ধরে ওখানে আড্ডা দিয়ো না, ছোটদির তিন ডজন গোল্‌ড্‌ স্টোন্‌, ছ-ছড়া পাথরের মালা, ছ-খানা ওয়াল-প্লেটের ফরমাস। শুনতে শুনতে দিকদারি ধরে গেল। কোনো মতে পেন্নাম-টেন্নাম সেরে শিয়ালদা স্টেশনে এসে হাড়ে বাতাস লাগল।

বাকি তিন মূর্তি অনেক আগেই এসে একটা থার্ড ক্লাস কামরায় জমিয়ে বসেছে। বেশি খুঁজতে হল না, টেনিদার বাজখাঁই গলার ডাক শোনা গেল—চলে আয় প্যালা, ইদিকে চলে আয়—



দেখি তিনজনেই তারিয়ে তারিয়ে অরেঞ্জ স্কোয়াশ খাচ্ছে।

গাড়িতে উঠে ধুপ করে বাক্স বিছানা রেখে প্রথমেই বললুম।

—বারে, আমার অরেঞ্জ স্কোয়াশ ?

—তর্টা কাটা গেছে। লেট কইর‍্যা আসছস, তার ফাইন।

হাবুল সেন জানিয়ে দিলে।

আমি চ্যাঁ-চ্যাঁ করে প্রতিবাদ জানালুম—লেট মানে ? এখনো কুড়ি মিনিট দেরি আছে ট্রেন ছাড়তে।

—যদি কুড়ি মিনিট আগেই ছেড়ে দিত, কী করতিস তা হলে ?

টেনিদা গম্ভীর গলায় জিগগেস করলে।

—কেন, কুড়ি মিনিট আগে ছাড়বে ? টাইম-টেবিল আছে না ?

—রেখে দে তোর টাইম টেবিল! চোঁ-চোঁ করে অরেঞ্জ স্কোয়াশটা সাবাড় করল টেনিদা। ও তো রেল কোম্পানির একটা হাসির বই। এই তো পরশু জেঠিমা এল হরিদ্বার থেকে, তুফান এক্সপ্রেসে চেপে। ভোর পাঁচটায় গাড়িটা আসবে বলে টাইম টেবিলে ছাপা রয়েছে, এল বেলা বারটার সময়। সাত ঘণ্টা লেট করে গাড়ি আসতে পারে, আর কুড়ি মিনিট আগে ছেড়ে দিতে

পারে না ? কী যে বলিস তার ঠিক নেই।

—যত বাজে কথা !—আমি চটে বললুম, আমিও একটা অরেঞ্জ স্কোয়াশ খাব।

টেনিদা বললে—খাবিই ?

—খাবই।

—নিজের পয়সায় ?

—নিশ্চয়।

ক্যাবলা বললে—তোর যেরকম তেজ হয়েছে দেখছি তাতে তোকে ঠেকানো যাবে না। তাহলে কিনেই ফেল। চারটে। মানে চারটেই তোর নিজের জন্য নয়, আমরাও আছি।

হাবুল মাথা নেড়ে বললে—হ, এই প্রস্তাব আমি সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করতাছি।

টেনিদা বললে—ডিটো।

ছাড়ল না। চারটেই কেনাল আমাকে দিয়ে। আর সেগুলো আমরা শেষ করতে না করতেই টিং-টিং-টিঙা-টিং করে নর্থ বেংগল এক্সপ্রেসের ঘণ্টা পড়ল।

পথের বর্ণনা আর দেব না, তোমরা যারা দার্জিলিঙে গেছ তারা সবাই তা ভালো করেই জানো। সক্‌রিগলির স্টিমারে গলাগলি করে, মনিহারিতে হারি-কি-জিতি বলে বাক্‌স ঘাড়ে করে বালির ওপর দিয়ে রেস লাগিয়ে সে যে কী দারুণ অভিজ্ঞতা সে আর বলে কাজ নেই। ক্যাবলা শুধু একবারে আছাড় খেয়ে কুমড়োর মতো গড়িয়ে গেল, কোত্থেকে কার এক ভাঁড় দই এসে হাবুল সেনের মাথায় পড়ল, আমার বাঁ পা-টা একটুখানি মচকে গেল আর ছোটো লাইনের গাড়িতে উঠবার সময় একটা ফচকে চেহারার লোকের সংগে টেনিদার হাতাহাতির জো হল।

এই সব দুর্ঘটনার পাট মিটিয়ে গুড়গুড়িয়ে আমরা শিলিগুড়িতে



পৌঁছুলুম ভোর বেলায়। দূরে নীল হয়ে রয়েছে হিমালয়ের রেখা, শাদা মেঘ তার ওপর দিয়ে ভেসে বেড়াচ্ছে। স্টেশনের বাইরে বাস আর ট্যাক্সির ভিড়।

—দার্জিলিং—দার্জিলিং—খরসাং—

—কালিম্পং—কালিম্পং—

টেনিদার সংগে মনিহারিতে যে মারামারি করবার চেষ্টা করছিল, সেই ফচকে চেহারার মিচকে লোকটা একটা বাসের ভেতরে বসে মিটমিট করে তাকাচ্ছিল আমাদের দিকে। দেখলুম, শিলিগুড়ির এই গরমের ভেতরেই লোকটা গায়ে নীল রঙের একটা মোটা কোট চড়িয়েছে, গলায় জড়িয়েছে চকোলেট রঙের আঁশ-ওঠা-ওঠা একটা পুরোনো মাফলার। মুখের সরু গোঁফটাকে বাগিয়ে এমন একখানা মুচকে হাসি হাসল যে পিত্তি জ্বলে গেল আমাদের।

লোকটা গলা বাড়িয়ে দিয়ে বললে—কী হে খোকারা, দার্জিলিং যাবে?

এসব বাজে লোকের বাজে কথায় কান দিতে নেই। কিন্তু মনিহারি থেকে চটেই ছিল টেনিদা। গাঁ-গাঁ করে বললে—আপনার মতো লোকের সংগে আমরা কোথাও যেতে চাই না।

লোকটা কি বেহায়া! এবারে দাঁত বের করে হাসল। আমরা



দেখতে পেলুম, লোকটার উঁচু উঁচু দাঁতগুলো পানের ছোপ লাগানো, তার দুটো আবার পোকায় খাওয়া।

—যাবে না কেন? বাসে বিস্তর জায়গা রয়েছে, উঠে পড়ো।

—না।

—না কেন?—তেমনি পানে রাঙানো পোকায় খাওয়া দাঁত দুটো দেখিয়ে ফচকে লোকটা চোখ কুঁচকে হাসল।—অ-রাগ হয়েছে বুঝি? তা রেলগাড়িতে ওঠা-নাবার সময় অমন দু-চারটে কথা-কাটাকাটি হয়েই থাকে। ও জন্যে কিছু মনে করতে নেই। তোমরা হচ্ছ আমার ছোট ভাইয়ের মতো, আদর করে একটু কান-টান মলে দিলেই বা কী করতে পারতে? এসো খোকারা, উঠে এসো। আমি তোমাদের পথের সিনারি দেখাতে দেখাতে নিয়ে যাব।

আস্পর্দা দেখ, আমাদের কান মলে দিতে চায়। লোকটা বাসে চেপে না থাকলে নির্ঘাত টেনিদার সংগে হাতাহাতিই হয়ে যেত। টেনিদা চিৎকার করে বললে—শাট আপ!

লোকটা এবার হি-হি করে হাসল।

—গেলে না তো আমার সংগে? হায়, তোমরা জান না, তোমরা কী হারাইতেছ!

—আমরা জানতে চাই না।

ভোঁপ-ভোঁপ শব্দ করে বাসটা ছেড়ে দিলে। লোকটা গলা বাড়িয়ে আবার বললে—তোমাদের একটা চকোলেট প্রেজেন্ট করে যাচ্ছি। হয়তো পরে আমার কথা ভাববার দরকার হবে তোমাদের। তখন আর এত রাগ থাকবে না।

বলতে বলতে কী একটা ছুড়ে দিলে আমাদের দিকে, আর পটলডাঙা থাণ্ডার ক্লাবের উইকেট কীপার ক্যাবলা নিছক অভ্যাসেই সেটা খপ করে ধরে ফেলল।

চকোলেটই বটে! পেল্লায় সাইজের একখানা।

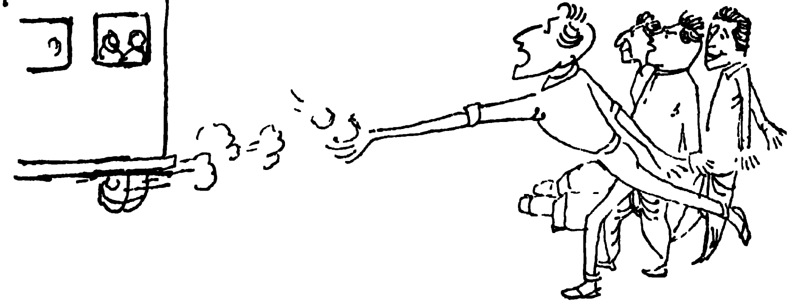
ক্যাবলা বললে—এটা ফেলে দিই টেনিদা?

চটে গেলেও খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে টেনিদার ভুল হয় না। ঝাঁ করে চকোলেটটা কেড়ে নিল ক্যাবলার হাত থেকে। মেজাজ চড়েই ছিল, একেবারে খ্যাঁক-খ্যাঁক করে উঠল।

—ইঃ, ফেলে দেবেন! অত বড় একটা চকোলেট ফেলে দিতে যাচ্ছেন। একেবারে নবাব সেরাজদৌল্লা এসেছেন। এটা আমার। আমিই তো ঝগড়া করে আদায় করলুম।

—আমরা ভাগ পামু না টেনিদা?—হাবুল সেন জানতে চাইল।

টেনিদা গম্ভীর হল।—পরে কনসিডার করা যাবে।—বলে চকোলেটটা পকেটস্থ করল।



সামনে বাস আর ট্যাক্সি সমানে ডাকাডাকি করছে—দার্জিলিং—খরসাং—কালিম্পং—

আমি বললুম—দাঁড়িয়ে থেকে কী হবে টেনিদা? একটা বাসে-টাসে উঠে পড়া যাক।

—দাঁড়া না ঘোড়ার ডিম। আগে সোরাবজির রেস্তোরাঁ থেকে ভালো করে রেশন নিয়ে নিই। নইলে পঞ্চাশ মাইল পাহাড়ি রাস্তায় যেতে যেতে পেটের নাড়িভুঁড়ি পর্যন্ত স্রেফ হজম হয়ে যাবে। চল, খেয়ে আসা যাক।

খেয়ে-দেয়ে বেরিয়ে এসে একটা ট্যাক্সি ঠিক করতে আরো ঘণ্টাখানেক গেল। তারপর বাক্স খুলে গরম কোট-টোট বের করে নিয়ে আমরা রওনা হলুম দার্জিলিঙের পথে।

নীল পাহাড়ের দিকে আমাদের গাড়িখানা ছুটে চলল তীরের বেগে। চমৎকার রাস্তা। একটু এগিয়ে চায়ের বাগান, তারপর দুধারে শুরু হয়ে গেল শালের বন। ঠাণ্ডা ছায়া আর হাওয়ায় শরীর জুড়িয়ে গেল যেন। আমি বেশ উদাস হয়ে গান জুড়ে দিলুম—আমার এই দেশেতেই জন্ম যেন এই দেশেতেই মরি—

হাবুল সেন কানে হাত চাপা দিয়ে বললে—ইস্, কী একখানা সুরই বাইর করতাছস্! গানটার বারোটা তো বাজাইলি!

না-হয় গলায় সুর-টুর আমার তেমন নেই। তাই বলে হাবুল সেন সে কথা বলবার কে! ও-ও তো গলা দিয়ে একটি সুর বের করতে পারে, সেটা হল গর্দভ-রাগিণী। আমি চটে বললুম—আহা-হা, তুই তো একেবারে সাক্ষাৎ গন্ধর্ব।

ক্যাবলা বললে—তুমলোগ কাজিয়া মৎ করো। (ক্যাবলা ছেলেবেলায় পশ্চিমে থাকত, তাই মধ্যে মধ্যে হিন্দি জবান বেরিয়ে আসে ওর মুখ দিয়ে) আসল কথা হল প্যালার এই গানটা এখানে গাইবার কোনো রাইট নেই। এই বনের ভেতর ও স্বচ্ছন্দেই মারা যেতে পারে। 'আমরা বাধা দিলেও মারা যেতে পারে, কিন্তু এখানে

কিছুতেই ওর জন্ম হয় নি। যদি তা হত, তাহলে ও গাছে গাছে লাফিয়ে বেড়াত, আমাদের সংগে এই মোটরে কিছুতেই বসে থাকত না।

আমাকে বাঁদর বলছে নাকি? একটু আগেই গাছে গোটা-কতককে দেখা গেছে—সেইটেই ওর বক্তব্য নয় তো?

আমি কী যেন বলতে যাচ্ছিলুম, হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল টেনিদা।

—এর মানে কী? কী মানে হয় এ কবিতার?

—কবিতা? কিসের কবিতা?

আমরা তিনজনে টেনিদার দিকে তাকালুম। একটা নীল রঙের ছোট কাগজ ওর হাতে।

—কোথায় পেলে ওটা?

টেনিদা বললে—ওই চকোলেটের প্যাকেটের ভেতর ভাঁজ করা ছিল।

টেনিদার হাত থেকে কাগজটা নিয়ে হাবুল সেন পড়ল—

মিথ্যে যাচ্ছ দার্জিলিং
সেখানে আছে হাত্তির শিং।
যাবে তো যাও নীল পাহাড়ি,
সেথায় নড়ে সবুজ দাড়ি।
সেইখানেতে ঝাউ বাংলায়
(লেখা নেইকো 'বুড়ো আংলা'য়)
গান ধরেছে হাঁড়িচাঁচায়,
কুণ্ডু মশাই মুণ্ডু নাচায়।

—শ্রীঝুমুরলাল চৌবে চক্রবর্তী

আমরা চারজন কবিতা পড়ে তো একেবারে থ! প্রায় পাঁচ মিনিট পরে মাথা চুলকে ক্যাবলা বললে—এর অর্থ কী?

ত্বধারের ছায়াঘেরা শালবনের ভেতর থেকে এর কোনো অর্থ খুঁজে পাওয়া গেল না।

॥ দুই ॥

সেই সবুজ দাড়ি

তারপর দার্জিলিংএ গিয়ে আমরা তো সব ভুলে-টুলে গিয়েছি। আর দার্জিলিংএ গেলে কারই-বা অন্য কথা মনে থাকে বলো! তখন আকাশ জুড়ে কাঞ্চনজঙ্ঘা ঝলমল্ করে, ম্যাল দিয়ে টগবগিয়ে ঘোড়া ছোটে, জলা পাহাড়ে উঠছি তো উঠছিই। সিঞ্চলের বুনো পথে কত রকম পাখি ডাকছে। কলকাতার গরমে মানুষ যখন আইঢাই করছে আর মনের দুঃখে আইসক্রিম খাচ্ছে তখন গরম কোট গায়ে দিয়েও আমরা শীতে ঠকঠক করে কাঁপছি।

আমরা উঠেছিলুম স্যানিটোরিয়ামে। হুল্লোড়ের এমন জায়গা কি আর দার্জিলিংএ আছে! পাহাড় ভেঙে ওঠানামা করতে এক-আধটু অসুবিধা হয় বটে, কিন্তু দিব্যি জায়গাটি! তাছাড়া খাশা সাজানো ফুলের বাগান, মস্ত লনে ইচ্ছে করলে ক্রিকেট ফুটবল খেলা যায়, লাইব্রেরির হলে টেবিল-টেনিস আর ক্যারামের বন্দোবস্ত। খাই-দাই, খেলি, ঘোড়ার চড়ি, বেড়াই আর ফটো তুলি। এক বটানিক্সেই তো শ-খানেক ছবি তোলা হল। এমনি করে চারপাঁচ দিন মজাসে কাটাবার পর একদিন ক্যাবলাটাই টিকটিক করে উঠল।

—দুৎ, ভালো লাগছে না।

আরো তিন জন এক সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলুম।

—ভালো লাগছে না মানে?

—মানে ভালো লাগছে না।

টেনিদা চটে বললে—কলেজে ক্লাশ করতে পারছে না কিনা, তাই ওর মন খারাপ। এখানকার কলেজ তো খোলাই রয়েছে। যা না কালই লজিকের ক্লাশে ঢুকে পড়।

ক্যাবলা বললে—যাও-যাও!

হাবুলসেন বললে—আমরা যামু ক্যান? আমরা এইখানে থাকুম। তর ইচ্ছা হইলে তুই যা গিয়া। যেইখানে খুশি।

ম্যালের বেঞ্চিতে বসে আমরা চারজনে চিনেবাদাম খাচ্ছিলুম, ক্যাবলা তড়াক করে উঠে পড়ল। বললে—তাহলে তাই যাচ্ছি। যাচ্ছি গাড়ি ঠিক করতে। কাল ভোরে আমি একাই যাব টাইগার হিলে সানরাইজ দেখতে।

টেনিদা সঙ্গে সঙ্গে একখানা লম্বা হাত বের করে ক্যাবলাকে পাকড়ে ফেলল।

—আরে তাই বল, টাইগার হিলে যাবি! এ তো সাধু প্রস্তাব। আমরাও কি আর যাব না?

—না, তোমাদের যেতে হবে না। আমি একাই যাব।

হাবুল গম্ভীর হয়ে বললে—পোলাপানের একা যাইতে নাই টাইগার হিলে। বাঘে ধইর‍্যা খাইবো।

—ওখানে বাঘ নেই।—ক্যাবলা আরো গম্ভীর।

আমি বললুম—বেশ তো, মোটরের ভাড়াটা তুই একাই দিস। তোর যখন এত জেদ চেপেছে তখন না-হয় একাই যাস। আমরা শুধু তোর বডিগার্ড হয়ে যাব এখন। মানে তোকে যদি বাঘে-টাগে ধরতে আসে—

ক্যাবলা হাত পা নেড়ে বললে—দুত্তোর, এগুলোর খালি বকর-বকর! সত্যিই যদি যেতে হয়, চলো এই বেলা গাড়ি ঠিক করে আসি, কদিন ধরে আবহাওয়া ভালো যাচ্ছে—বেশি মেঘ বা কুয়াশা হলে গিয়ে শীতে কাঁপাই সার হবে।

পরদিন ভোর চারটার টাইগার হিলে রওনা হলুম আমরা। বাপস্ কী ঠাণ্ডা! দার্জিলিং ঠাণ্ডায় জমে আছে। ঘুম স্টেশনে রাশি রাশি লেপ কম্বল গায়ে জড়িয়ে ঘুমে অচেতন। শীতের হাওয়ায় নাক কান ছিঁড়ে উড়ে যাওয়ার জো। ল্যাণ্ড রোভার গাড়ি, ঢাকাঢুকি বিশেষ নেই, প্রাণ ত্রাহি ত্রাহি করে উঠল।

টেনিদা চটে বললে—ধুত্তোর ঘোড়ার ডিমের টাইগার হিল। ক্যাবলার বুদ্ধিতে পড়ে যত ভোগান্তি। একেবারে জমিয়ে দিলে।

হাবুল বললে—হ আমাগো আইসক্রিম বানাইয়া ছাড়বো।

—লেপ-টেপগুলো গায়ে জড়িয়ে এলে ভালো হত।

আমি জানালুম।

ক্যাবলা বললে—অত বাবুগিরি শখ যখন, কলকাতায় থাকলেই পারতে। পৃথিবীর কত দেশ থেকে কত লোক সঙ্গে করে টাইগার হিলে সানরাইজ দেখতে আসে আর এইটুকু ঠাণ্ডায় ওঁদের একেবারে প্রাণ বেরিয়ে গেল !

—অ—এইটুকু ঠাণ্ডা!—দাঁত ঠকঠকিয়ে টেনিদা বললে।—এই-টুকু ঠাণ্ডায় বুঝি তোর মন ভরছে না ! আচ্ছা বেশ, কাল মাঝরাতে তোকে এক বালতি বরফ জল দিয়ে স্নান করিয়ে দেব এখন।

আমি বললুম—শরীর গরম করার বেস্ট উপায় হচ্ছে গান। এসো কোরাসে গান ধরা যাক।

টেনিদা গজ-গজ করে কী যেন বললে, ক্যাবলা চুপ করে রইল, কিন্তু গানের নামে হাবুল একপায়ে খাড়া। দুজনে মিলে যেই গলা ছেড়ে ধরেছি ; 'হাঁই মারো, মারো টান হাঁইয়ো' অমনি নেপালি ড্রাইভার দারুণ আতঙ্কে হাঁই-হাই করে উঠল। পরিষ্কার বাংলা ভাষায় বললে—অমন বিচ্ছিরি করে চেঁচিয়ে চমকে দেবেন না বাবু। খাড়া পাহাড়ি রাস্তা—শেষে একটা অ্যাক্সিডেন্ট করে ফেলব !

কী বেরসিক লোক !

টেনিদা মোটা গলায় বললে—রাইট। গান তো নয় যেন একজোড়া শেয়াল কাঁঠাল গাছে তলায় বসে মরা কান্না জুড়েছে।

ক্যাবলা ফিক্ ফিক্ করে হাসতে লাগল। আর আমি ভীষণ মন খারাপ করে বসে রইলুম। হাবুল আমার কানে ফিস্-ফিস্ করে সান্ত্বনা দিয়ে বললে—তুই মনে দুঃখ পাইস না প্যালা। কাইল তুই আর আমি নিরিবিলিতে বার্চ-হিলে গিয়া গান করুম। এই

গুলানে আমাগো গানের কদর কি বুঝবো!

যাই হোক্ টাইগার-হিলে তো গিয়ে পৌঁছোনো গেল। সেখানে এর মধ্যেই বিস্তর গাড়ি আর বিস্তর লোক জড়ো হয়েছে। পাহাড়ের মাথায় সানরাইজ দেখার যে জায়গাটা রয়েছে তার একতলা-দোতলা একেবারে ভরতি। আমরা পাশাপাশি করে দোতলায় একটুখানি দাঁড়াবার ব্যবস্থা করে নিলুম।

সামনের অন্ধকার কালো পাহাড়টার দিকে চেয়ে আছি সবাই। ওখান থেকেই সূর্য উঠবে, তারপর বাঁ দিকের ঘুমন্ত কাঞ্চনজঙ্ঘার ওপর সাত রঙের মায়া ছড়িয়ে দেবে। রাশি রাশি ক্যামেরা তৈরি হয়ে রয়েছে। পাহাড় আর বনের কোলে থেকে থেকে কুয়াশা ভেসে উঠছে আবার মিলিয়ে যাচ্ছে।

তারপর সেই সূর্য উঠল। কেমন উঠল? কিরকম রঙের খেলা দেখা দিল মেঘ আর কাঞ্চনজঙ্ঘার ওপরে? সে আর আমি বলব না। তোমরা যারা টাইগার হিলে সূর্যোদয় দেখেছ তারা তা জানোই; যারা দেখোনি না দেখলে কোনোদিন তা জানতে পারবে না।

ক্লিক্ ক্লিক্ ক্লিক্! খালি ক্যামেরার শব্দ। আর চারিদিকে শুনতে পাচ্ছি 'অপূর্ব! অদ্ভুত! ইউনিক!'

টেনিদা বললে—সত্যি ক্যাবলাকে মাপ করা যেতে পারে। এমন গ্র্যাণ্ড সিনারি কোনোদিন দেখিনি।

ঠিক সেই সময় পাশ থেকে মোটা গলায় কে বললে—তাই নাকি? কিন্তু এর চেয়েও ভালো সিনারি দেখতে হলে নীল পাহাড়িতেই যাওয়া উচিত তোমাদের।

নীলপাহাড়ি! আমরা চারজনেই একসঙ্গে লাফিয়ে উঠলুম। সঙ্গে সঙ্গে সেই অদ্ভুত ছড়াটার কথা মনে পড়ে গেল আমাদের।

একটা ঢাউস কম্বলে লোকটার মুখ-টুক সব ঢাকা, শুধু নাকটা বেরিয়ে আছে। সে আবার মোটা গলায় সুর টেনে বললে—

গান ধরেছে হাঁড়িচাঁচায়,
কুণ্ডু মশাই মুণ্ডু নাচায়।

বলেই সে কম্বলটা সরিয়ে দিলে আর আবছা ভোরের আলোয় আমরা দেখলুম, তার গলায় আঁশ-ওঠা একটা চকোলেট রঙের মাফলার জড়ানো, তার মিচকে মুখে মিচকি হাসি।

—কে ?—কে ?—বলে টেনিদা যেই চেঁচিয়ে উঠেছে, অমনি চারদিকের ভিড়ের মধ্যে কোথায় সুট করে মিলিয়ে গেল লোকটা।

টেনিদা বললে—হারি আপ! ধরতেই হবে ওকে।

কিন্তু সেই গাদাগাদি ভিড়ের ভেতর কোথাও আর তাকে দেখা দেখা গেল না। দোতলায় নয়, একতলায় চায়ের স্টলে নয়, এমনকি বাইরে যে সব গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল, তাদের ভেতরেও কোথাও নয়। যেন কুয়াশার ভেতর থেকে সে দেখা দিয়েছিল, আবার কুয়াশার মধ্যেই কোথায় মিলিয়ে গেল।

আমরা চারজন অনেকক্ষণ বোকার মতো দাঁড়িয়ে রইলুম। সূর্য অনেকখানি উঠে পড়ল আকাশে, চারদিক ভরে গেল সকালের আলোয়, ঝকমক করে জ্বলতে লাগল কাঞ্চনজঙ্ঘা। একটার পর একটা গাড়ি নেমে যেতে লাগল দার্জিলিংয়ের দিকে। সেই রহস্যময় লোকটা কোথায় অদৃশ্য হল কে জানে!

টেনিদা বললে—স্ট্রেঞ্জ!

আমি বললুম—রীতিমত গোয়েন্দা কাহিনী! হেমেন্দ্রকুমারের উপন্যাসের চেয়েও রহস্যময়।

হাবুল সেন কান-টান চুলকে বললে—আমার মনে হইতাছে—এই সমস্ত ভূতের কাণ্ড।

ক্যাবলাটারই আমাদের ভেতরে সব চাইতে মাথা ঠাণ্ডা। এবং আগে ঝন্টি পাহাড়িতে কিংবা ডুয়ার্সের জঙ্গলে সব সময়েই দেখেছি ও কিছুতেই ঘাবড়ায় না। ক্যাবলা বললে—ভূত হোক কিংবা পাগলই হোক সুবিধে পেলেই ওর সঙ্গে মোকাবেলা করা যাবে।

কিন্তু এখন ওসব ভেবে লাভ নেই, চলো, বেশ করে চা খাওয়া যাক।

চা-টা খেয়ে বেরিয়ে আমরা কেভেন্টারের ডেয়ারি দেখতে গেলুম, সেখানে পেল্লায় পেল্লায় গোরু আর ঘাড়ে গর্দানে ঠাসা মোটা শুয়োর দেখলেই আমার গবেষণা করতে ইচ্ছা হয়। কেমন মনে হয় ছুঁচো আর শুয়োর পিসতুতো ভাই। একটা ছুঁচোর ল্যাজ একটু কেটে দিয়ে বেশ করে ভিটামিন খাওয়ালে সেটা নির্ঘাত একটা পুরুষ্টু শুয়োরে দাঁড়িয়ে যাবে বলে আমার ধারণা। প্রায়ই ভাবি ডাক্তার মেজদাকে একটু জিগগেস করে দেখব। কিন্তু মেজদার যা খিটখিটে মেজাজ তাতে জিগগেস করতে ভরসা হয় না। আচ্ছা মেজাজওয়ালা দাদাই কি সংক্ষেপে মেজদা হয়? কে জানে।

ওখান থেকে বেরিয়ে আমরা গেলুম সিঞ্চল লেক দেখতে। লেক মানে কলকাতার লেক নয়, চিল্‌কাও নয়। তুটো মস্ত চৌবাচ্চায় ঝরনার জল ধরে রাখে, আর তাই পাইপে করে দার্জিলিংয়ের কলে পাঠিয়ে দেয়। দেখে মেজাজ বিগড়ে গেল।

কিন্তু জায়গাটি বেশ। চারদিকে বন, খুব নিরিবিলি। বসবার ব্যবস্থাও আছে এখানে ওখানে। ভোরবেলায় গানটা গাইবার সময় বাধা পড়াতে মনটা খারাপ হয়েই ছিল, ভাবলুম এখানে নিরিবিলিতে একটু গলা সেধে নিই।

ওরা তিনজন দেখছিল, কি করে জল পাম্প করে তোলে। আমি একা একটা বাঁধানো জায়গাতে গিয়ে বসলুম। তারপর বেশ গলা ছেড়ে ধরলুম—

খর বায়ু বয় বেগে, চারিদিক ছায় মেঘে
ওগো নেয়ে, নাওখানি বাইয়ো—

ঠিক তক্ষুনি পেছন থেকে কে বললে—সাবাশ।

তাকিয়ে দেখি বনের রাস্তা দিয়ে এক ভদ্রলোক উঠে এসেছেন। মাথায় একটা বাঁদুরে রঙের কান-ঢাকা টুপি, চোখে নীল চশমা, হাতে মোটা লাঠি, মুখে পাকা গোঁফ।



ভদ্রলোক বললেন—বেশ গাইছ তো! তোমার অরিজিনালিটি আছে দেখছি। মানে গানটা রবিঠাকুরের হলেও বেশ নিজের মতো করে সুর দিয়েছ!

চটব, না খুশি হব—বুঝতে পারলুম না।

ভদ্রলোক বললেন—তোমার মতো প্রতিভাবান ছেলেই আমার দরকার। যাবে আমার সঙ্গে?

অবাক হয়ে আমি বললুম—কোথায়?

ভদ্রলোক হেসে বললেন—নীলপাহাড়ি।

সেই নীলপাহাড়ি! আমি বিষম খেলুম একটা।

ভদ্রলোক হেসেই চললেন—কী আছে দার্জিলিংয়ে? কিছু না! ভিড়—ভিড়—ভিড়। শুধু ম্যালে বসে হাঁ করে থাকা, নয় খামোকা ঘোড়া দাবড়ানো আর নইলে শীতে কাঁপতে-কাঁপতে একবার টাইগার হিল দেখে আসা। কোনো মানে হয় ও সবের! চল নীল-পাহাড়িতে। দেখবে কী আশ্চর্য জায়গা—কী ফুল—কী অপূর্ব রহস্য! আমি সেখানেই থাকি। সেখানকার ঝাউ বাংলোয়।

ঝাউ-বাংলো! আমি আবার খাবি খেলুম।

তখন ভদ্রলোক একটানে বাঁদুরে টুপিটা খুলে ফেললেন। টুপির আড়ালে একমুখ দাড়ি। কিন্তু আসল রহস্য সেখানে নয়, আমি দেখলুম তাঁর দাড়ির রং সবুজ! একেবারে ঘন সবুজ!

একবার হাঁ করেই মুখটা বন্ধ করলুম আমি। আমার মাথাটা ঘুরতে লাগল। লাট্টুর মতো। বনবনিয়ে।



॥ তিন ॥

ফরমুলা বনাম কাগামাছি

আমার মাথাটা সেই যে বনবনিয়ে লাট্টুর মতো ঘুরতে লাগল, তাতে মনে হল সারা সিঞ্চল পাহাড়টাতেই আর গাছগাছালি কিছু নেই, সব সবুজ রঙের দাড়ি হয়ে গেছে। আর সেই দাড়িগুলো আমার চারপাশে বোঁ বোঁ করে পাক খাচ্ছে।

দাঁড়িয়ে উঠেছিলুম, সঙ্গে সঙ্গেই ধপাস করে বাঁধানো বেঞ্চিটায় বসে পড়তে হল।

বুড়ো ভদ্রলোক বললেন—কী হল খোকা ?

আমি উত্তরে বললুম—ওফ্‌!

—ওফ্‌, মানে ? ভদ্রলোক ব্যস্ত হয়ে বললেন—ব্যাপার কিহে ? পেট কামড়াচ্ছে ? ফিক্ ব্যথা উঠেছে ? নাকি মৃগী আছে তোমার ? এইটুকু বয়সেই এইসব রোগ তো ভালো নয় !

মাথাটা একটু একটু সাফ হচ্ছে, আমি কিছু একটা বলতে গেলুম। তার আগেই তিনমূর্তি—টেনিদা, ক্যাবলা আর হাবুল সেন এসে পৌঁছেছে। আর বুড়ো ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকিয়েই—হাবুল সেন 'খাইছে' বলে দু-হাত লাফিয়ে সরে গেল। ক্যাবলার চোখ দুটো ঠিক আলুর চপের মতো বড় বড় হয়ে উঠল। আর টেনিদা বলে ফেলল—ডি লা গ্র্যাণ্ডি মেফিস্টোফিলিস্ !

ভদ্রলোক ভুরু কুঁচকে চারদিক তাকালেন। বললেন—কী হয়েছে বলো দেখি ? তোমরা সবাই আমাকে দেখে অমন ঘাবড়ে যাচ্ছ কেন ? আর ওই যে কী বললে—'ডি লা মেফিস্টোফিলিস্'—ওরই বা মানে কী ?

টেনিদা বললে—ওটা ফরাসি ভাষা।

—ফরাসি ভাষা! ভদ্রলোক তার সবুজ দাড়ি বেশ করে চুমরে নিয়ে বললেন—আমি তো দশ বছর ফ্রান্সে ছিলুম, এরকম ফরাসি ভাষা তো কখনো শুনি নি। আর মেফিস্টোফিলিস্ মানে তো শয়তান। তোমরা আমাকে বুড়ো মানুষ পেয়ে খামোকা গালাগালি দিচ্ছ নাকি হে?

এবার মনে হল, ভদ্রলোক রীতিমত চটেই গেছেন।

আমাদের ভেতর ক্যাবলাই সবচাইতে চালাক আর চটপটে, ও কিচ্ছুতে কক্ষনো ঘাবড়ে যায় না। ওই সাহস করে ভদ্রলোকের কাছে এগিয়ে এল। বললে—আজ্ঞে আপনার দাড়িটা···

—কী হয়েছে দাড়িতে?

—মানে সবুজ রঙের দাড়ি আমরা কেউ কখনো দেখিনি কিনা, তাই—

—ওঃ, এই কথা! —ভদ্রলোক এবার গলা ছেড়ে হেসে উঠলেন আর আমরা দেখতে পেলুম, ওঁর সামনের পাটিতে একটা দাঁত নেই, আর একটা দাঁত সোনা দিয়ে বাঁধানো। হাসির সঙ্গে সঙ্গে ওঁর নাক দিয়ে ফোঁত ফোঁত আওয়াজ হল।

বেশ খানিকটা সোনালি দাঁতের ঝিলিক আর ফোকলা দাঁতের ফাঁক দেখিয়ে হাসি থামালেন। তারপর বললেন—ওটা আমার শখ। আমি একজন প্রকৃতি প্রেমিক, মানে বন-জঙ্গল গাছপালা এই সব নিয়ে পড়ে থাকি। একটা বইও লিখছি গাছ-টাছ নিয়ে। তাই শ্যামল প্রকৃতির সঙ্গে ছন্দ মেলাবার জন্যে দাড়িটাকেও সবুজ রঙে রাঙিয়ে নিয়েছি। বুঝতে পারলে?

টেনিদা হঠাৎ ফস্ করে জিগগেস করলে—আপনি কবিতা লেখেন স্যার?

হাবুল বললে—হ-হ, আপনি পদ্য লিখতে পারেন?—

—পদ্য? কবিতা?—ভদ্রলোকের মুখখানা আবার আহ্লাদে

ভরে উঠল—তা লিখেছি বই কি এককালে। তোমাদের তখন জন্ম হয়নি। তখন কত কবিতা মাসিক পত্রে বেরিয়েছে আমার। এখন অবশ্যি ছেড়ে ছুড়ে দিয়েছি। কিন্তু মগজে ভাব চাগিয়ে উঠলে মাঝে মাঝে দুটো-চারটে বেরিয়ে আসে বৈকি। এই তো সেদিন রাত্তিরে চাঁদ উঠেছে, পাইন গাছের মাথাগুলো ঝলমল্ করছে, আর আমি বসে বসে একটা ইংরেজি প্রবন্ধ লিখছি। হঠাৎ সব কিরকম হয়ে গেল। তাকিয়ে দেখি আমার কলমটা যেন আপনিই তরতর করে কবিতা লিখে চলেছে। কি লিখেছিলুম একটু শোনো—

ওগো চাঁদিনী রাতের পাইন—
ঝলমল করছে জ্যোৎস্না
দেখাচ্ছে কী ফাইন!
ঝিরঝির করে ঝরনা ঝরছে
প্রাণের ভেতর কেমন করছে
ভাবগুলো সব দাপিয়ে মরছে
ভাঙছে ছন্দের আইন—
ওগো পাইন।

—কী রকম লাগল?

আমরা সমস্বরে বললুম—ফাইন! ফাইন!

ভদ্রলোক আর একবার দাড়িটা চুমরে নিয়ে গম্ভীর হয়ে গেলেন। আরো কোনো কবিতা বোধহয় তার মাথায় আসছিল। কিন্তু ক্যাবলা ফস্ করে জিগগেস করলে—আপনি মুণ্ডু নাচাতে পারেন?

—মুণ্ডু নাচাব? কার মুণ্ডু নাচাতে যাব আবার?

টেনিদা জিগগেস করলে—আপনি কুণ্ডু মশাই বুঝি?

—কুণ্ডুমশাই? আমার চৌদ্দপুরুষেও কেউ কুণ্ডুমশাই নেই। আমার নাম সাতকড়ি সাঁতরা। আমার বাবার নাম পাঁচকড়ি

সাঁতরা। আমার ঠাকুর্দার নাম—

হাবুল বলে ফেলল—তিনকড়ি সাঁতরা।

সাতকড়ি অবাক হয়ে গেলেন—তুমি জানলে কী করে?

—দুইটা কইর‍্যা সংখ্যা বাদ দিতে আছেন কিনা, তাই হিসাব কইর‍্যা দেখলাম। আপনের ঠাকুর্দার বাবার নাম হইবো এককড়ি সাঁতরা। তেনার বাবার নাম যে কী হইবো—হিসাবে পাইতাছি না। মাইনাস্ দিয়া করন লাগবো মনে হয়।

—শাবাশ-শাবাশ!—সাতকড়ি সাঁতরা হাবুলের পিঠটা বেশ ভালো করে থাবড়ে দিলেন।—তোমার তো খুব বুদ্ধি আছে দেখছি। কিন্তু আমার ঠাকুর্দার ঠাকুর্দার কথা ভেবে আর মন খারাপ কোরো না—তাঁর নাম আমারও জানা নেই। যাই হোক, ভারি খুশি হলুম। আমি তোমাদের চারজনকেই ঝাউ-বাংলোয় নিয়ে যাব।

—ঝাউ-বাংলো!—ওরা তিনজনেই এক সঙ্গে লাফিয়ে উঠল।

—আহা! সেই কথাই তো বলছিলুম তোমার এই বন্ধুকে। আহা, কী জায়গা! দার্জিলিংয়ের মতো ভিড় নেই; চেঁচামেচি নেই, নোংরাও নেই। পাইন আর ঝাউয়ের বন। তার ভেতর দিয়ে সারি সারি ঝরনা নামছে। কত ফুল ফুটেছে এখন, শানাই, হাইড্রেনজিয়া, ফরগেট-মি-নট, রডোড্রেনডন এখন লালে লাল। আর, আর তার মাঝে আমার বাংলো।

সাতকড়ি যেন ঘুমপাড়ানি গানের মতো সুর টেনে চললেন—তিনদিন যদি ওখানে থাকো, তাহলে তোমাদের যারা নিরেট বেরসিক তারাও তরতর করে কবিতা লিখতে শুরু করে দেবে।

—কিন্তু তার আগে যদি ঝুমুরলাল চৌবে চক্রবর্তীর ছড়াটার মানে বোঝা যেত—

সাতকড়ি বললেন—কী বললে? ঝুমুরলাল চৌবে চক্রবর্তীর ছড়া? কী বিটকেল নাম! ও নামে কেউ আবার ছড়া লেখে নাকি?

—আজ্ঞে লেখে, তাও আবার আপনার ঝাউ-বাংলোকে নিয়ে।

—অ্যাঁ!

—তাতে আপনার সবুজ দাড়ির কথাও আছে।

—বটে! লোকটার নামে আমি মানহানির মামলা করব।

টেনিদা বললে—তাকে আপনি পাচ্ছেন কোথায়? সেই মিচকে পটাশ লোকটা এক-একবার দেখা দিয়েই মিলিয়ে যায়। সে বলেছে, আপনার ঝাউ-বাংলোয় নাকি হাঁড়িচাঁচায় গান গায়।

সাতকড়ি চটে গেলেন—হাঁড়িচাঁচায় গান গায়? নীলপাহাড়িতে হাঁড়িচাঁচা কোত্থেকে আসবে? ও বুঝেছি। আমি মধ্যে মধ্যে শ্যামাসঙ্গীত গেয়ে থাকি বটে। তার নাম হাঁড়িচাঁচার গান? লোকটাকে আমি জেলে দেব।

—আরো বলেছে, সেখানে কুণ্ডুমশায় মুণ্ডু নাচায়।

—স্রেফ বাজে কথা। সেখানে কুণ্ডুমশায় বলে কেউ নেই। আমি আছি আর আছে আমার চাকর কাঞ্ছা। নিজের মুণ্ডু নাচানো আমি একদম পছন্দ করি না। কাঞ্ছাও করে বলে মনে হয় না আমার।

ক্যাবলা বললে—শুধু তাই নয়। আপনি বলার আগে সেই আমাদের ঝাউ-বাংলোয় নেমন্তন্ন করেছে।

—আমার বাড়িতে মিচকে আর ফচকে লোক তোমাদের নেমন্তন্ন করে বসেছে? আচ্ছা ফেরেব্বাজ তো। লোকটাকে ফাঁসি দেওয়া উচিত!

হাবুল বললে—তারে আপনি পাইবেন কই?

তখন সাতকড়ি সাঁতরা মিনিটখানেক খুব গম্ভীর হয়ে রইলেন। তারপর হঠাৎ সেই বেঞ্চিটায় বসে পড়লেন। আর ভীষণ করুণ সুরে বললেন—হুঁ, বুঝেছি, সব বুঝতে পেরেছি এইবার।

আমরা চারজনে চেঁচিয়ে উঠলুম।—কী বুঝেছেন?

—এ সেই কদম্ব পাকড়াশির কাণ্ড। *

—কে কদম্ব পাকড়াশি ?

—আমার চির শত্রু। যখন কবিতা লিখেছি, তখন কাগজে কাগজে আমার কবিতার নিন্দে করত। এখন সে বিখ্যাত জাপানি বৈজ্ঞানিক কাগামাছির গুপ্তচর। আমার নতুন আবিষ্কৃত ফরমুলা-গুলো সে লোপাট করে নিতে চায়! আমি বুঝতে পারছি—ঝাউ-বাংলোয় এক দারুণ দুর্দিন আসছে। চুরি-ডাকাতি-হত্যা রক্তপাত। ওফ্!

এক দারুণ রহস্যের সন্ধান পেয়ে আমরা চারজনে শিউরে উঠলুম। হাবুল সেন তো সঙ্গে সঙ্গে এক চিৎকার ছাড়ল। টেনিদার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখি, ওর মৈনাকের মতো লম্বা নাকটা কিরকম ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেছে, ঠিক একটা শিঙাড়ার মতো দেখাচ্ছে এখন। খানিকক্ষণ মাথা-টাথা চুলকে বললে—চুরি-ডাকাতি-হত্যা-রক্তপাত! এ যে ভীষণ কাণ্ড মশাই। পুলিশে খবর দিন।

—পুলিশ! পৃথিবীর সবকটা মহাদেশের পুলিশ দশ বছর চেষ্টা করেও কাগামাছির টিকিটি ছুঁতে পারে নি। অবশ্যি কাগামাছির কোনো টিকি নেই—তার মাথাজোড়া সবটাই টাক। নানা ছদ্মবেশে সে ঘুরে বেড়ায়। কখনো তিব্বতি লামা, কখনো মারোয়াড়ি বিজনেস্‌ম্যান, কখনো রাত্তিরবেলা কলকাতার গলিতে দুমুখো আলো হাতে মুশকিল আশান। পৃথিবীর সব ভাষায় কাগামাছি কথা কইতে পারে। শুধু তাই? একবার সে এক কাঁটাবনের মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে এমন সময় সেদিকে পুলিশ এসে খোঁজাখুজি করতে লাগল। ধরে ফেলে—এমনি অবস্থা। তখন সেই ঝোপের মধ্য থেকে পাগলা শেয়ালের মতো খ্যাঁক-খ্যাঁক আওয়াজ করতে লাগল। পুলিশ ভাবল, কামড়ালেই জলাতঙ্ক—তারা পালিয়ে বাঁচল সেখান থেকে।

—তাহলে আপনি বলছেন সেই মিচকে চেহারার ফচকে

লোকটাই কাগামাছি ?—আমি জানতে চাইলুম।

—না, ওটা কদম্ব পাকড়াশি। ওর মুখে একজোড়া সরু গোঁফ ছিল ?

—ছিল।—হাবুল পত্রপাঠ জবাব দিলে।

—আর গলায় একটা রোঁয়া-ওঠা মেটে রঙের ধুশো কম্ফর্টার ?

—তাও ছিল।—এবার ক্যাবলাই সাতকড়িবাবুকে আলোকিত করল।

—তবে আর সন্দেহ নেই। ওই হচ্ছে সেই বাপে-খেদানো মায়ে-তাড়ানো হাড়হাবাতে রাম-ফক্কড় কদম্ব পাকড়াশি।

—তা হঠাৎ আপনার ওপরে ওদের নজর পড়ল কেন ?—টেনিদা আবার জিগগেস করল।

হাবুল বললে—আহা শোন নাই ? ওনার কী য্যান্ মুলার উপর তারগো চক্ষু পড়ছে।

টেনিদা বললে—মুলো ? মুলোর জন্য এত কাণ্ড ? আমাদের শেয়ালদা বাজারে পয়সায় তো একটা করে মুলো পাওয়া যায়। তার জন্যে চুরি-ডাকাতি-রক্তপাত ? কী যে বলেন স্যার—কোনো মানে হয় না !

সাতকড়ি সাঁতরা বিষম ব্যাজার হয়ে বললেন—মুলো কে বলেছে ? মুলো আমার একদম খেতে ভালো লাগে না, খেলেই চোঁয়া ঢেঁকুর ওঠে। আমি বলছিলুম ফরমুলা।

হাবুল বিজ্ঞের মতো মাথা নেড়ে বললে—অ—ফরমুলা ! তা ফরমুলার কথা ক্যাবলারে কন। আমাদের মধ্যে ও-ই হইল অঙ্কে ভালো—সব বুঝতে পারবো।

—তোমরাও বুঝতে পারবে। আমি গাছপালা নিয়ে রিসার্চ করতে করতে এক আশ্চর্য আবিষ্কার করে বসেছি। অর্থাৎ একই গাছে এক সঙ্গে আম-কাঁঠাল-কলা-আনারস-আপেল আর আঙুর ফলবে। আর বারো মাসেই ফলবে।

—তাই নাকি ?—শুনে তো আমরা থ।

—সেই জন্যেই।—সাতকড়ি সাঁতরা বিষণ্ণভাবে মাথা নাড়লেন। —সেই জন্যই এই চক্রান্ত! ওহো হো! আমার কী হবে!

—কিন্তু কিছুই ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। ক্যাবলাকে একটু সন্দিগ্ধ মনে হল।—ফরমুলা চুরি করতে হলে সেটা তো চুপি চুপি করাই ভালো। সেজন্য পথে ঘাটে এমন করে ছড়ার ছড়া-ছড়ি করার কী মানে হয়? সবই তো জানাজানি হয়ে যাবে।

—ওই তো কাগামাছির নিয়ম। গোড়া থেকেই এইভাবে সে রহস্যের খাসমহল তৈরি করে নেয়।—বলতে বলতে সাতকড়ি সাঁতরা প্রায় কেঁদে ফেললেন।—এই বিপদে তোমরা আমায় বাঁচাবে না? তোমরা এ-যুগের ইয়ংম্যান। এই দুঃসময়ে পাশে এসে দাঁড়াবে না আমার?

এমন করুণ করে বললেন যে আমারই বুকের ভেতরটা 'আ-হা আ-হা' করতে লাগল। আর ফস করে টেনিদা বলে ফেলল— নিশ্চয় করব, আলবত করব!

—কথা রইল!

—কথা রইল।

—বাঁচালে। বলে সাতকড়ি সাঁতরা উঠে দাঁড়ালেন। তারপর বললেন—তাহলে আজ বিকেল সাড়ে চারটেয় দেখা হবে তোমাদের সঙ্গে। ন্যাচরাল মিউজিয়মের ওপরে যে পার্কটা আছে সেখানে।

আর বলেই সুট করে কাঠবেড়ালির মতো পাশে বনটার ভেতরে তার সবুজ দাড়ি, ওভারকোট আর হাতের লাঠিটা নিয়ে ঠিক সেই মিচকে পটাশ কদম্ব পাকড়াশির মতোই হাওয়া হয়ে গেলেন তিনি।

॥ চার ॥

চকোলেট নাম্বার টু

সবুজ দাড়ি, বাঁদুরে টুপি, নীল চশমা আর ধুশো ওভারকোট-পরা সাতকড়ি সাঁতরা তো সাঁ করে সিঞ্চলের সেই বনের মধ্যে টুপ করে ডুব মারলেন। আর কলকাতার কাকেরা যেমন হাঁ করে বসে থাকে, তেমনি করে আমরা চারজন এ-ওর মুখের দিকে চেয়ে রইলুম। শেষে হাবুল সেনই তিড়িং করে লাফিয়ে উঠল। একটা ক্ষুদে পাহাড়ি মৌমাছি ওর কান তাক করে এগিয়ে আসছিল দেখে, তিন পা নেচে নিয়ে মৌমাছিটাকে তাড়িয়ে দিলে।

হাবুল বললে—কাণ্ডটা কি হইল টেনিদা ?

টেনিদার মাথায় কোনো গভীর চিন্তা এলেই সে ফরাসি ভাষা শুরু করে। বললে—ডি-লুক্স !

আমি বললুম—তার মানে ?

টেনিদা আবার ফরাসি ভাষায় বললে—পুঁদিচ্চেরি !

ক্যাবলা বললে—পুঁদিচ্চেরি ? সে তো পণ্ডিচেরি ! এর সংগে পণ্ডিচেরির কী সম্পর্ক ?

টেনিদা দাঁত খিঁচিয়ে বললে—থাম থাম ! পণ্ডিচেরি ! খুব যে পণ্ডিতি ফলাতে এসেছিস। ফরাসি ভাষায় পুঁদিচ্চেরি মানে হল, —ব্যাপার অত্যন্ত ঘোরালো।

ক্যাবলা প্রবল প্রতিবাদ করে বললে—কক্ষনো না। আমার পিসেমশাই পণ্ডিচেরিতে ডাক্তারি করতেন। আমি জানি।

—জানিস ?

—জানি।



টেনিদা খটাং করে তক্ষুনি ক্যাবলার চাঁদিতে একটা গাঁট্টা মারল। ক্যাবলা উ-হু-হু করে বাগ্‌দা চিংড়ির মতো ছটকে গেল টেনিদার সামনে থেকে।

—এখনো বল, জানিস?—বাঘাটে গলায় টেনিদার প্রশ্ন।

—না, জানি নে।—ক্যাবলা চাঁদিতে হাত বুলোতে লাগল—যা জানতুম তা ভুলে গেছি। তোমার কথাই ঠিক। পুঁদিচ্চেরি মানে ব্যাপার অত্যন্ত সাংঘাতিক। আর কত যে সাংঘাতিক, নিজের মাথাতেই টের পাচ্ছি সেটা।

টেনিদা খুশি হয়ে বললে—অল রাইট। বুঝলি ক্যাবলা, ইস্কুল ফাইনালে স্কলারশিপ পেয়ে তোর ভারি ডেঁপোমি হয়েছে। আবার যদি কুরুবকের মতো বকবক করিস তাহলে এক চড়ে তোর কান—

হাবুল বললে—কানপুরে উইড়্যা যাইবো।

—কারেক্ট! এই জন্যেই তো বলি হাবলাই হচ্ছে আমার ফার্স্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট। সে যাক! এখন কী করা যায় বল দিকি? এই সবুজদেড়ে লোকটা তো মহা ফ্যাচাঙে ফেলে দিলে!

ক্যাবলা বললে—আমরা কথা দিয়েছি ওকে হেলপ করব।

—তারপর যদি সেই জাপানি বৈজ্ঞানিক কাগামাছি এসে আমাদের ঘাড়ে চড়াও হয়?

আমি বললুম—তাকে মাছির মতোই সাবাড় করে ফেলব!

—কে সাবাড় করবে, তুই!—টেনিদা আমার দিকে তাকিয়ে, নাক-টাক কুঁচকে, মুখটাকে আলুসেদ্ধর মতো করে বললে—ওই পুঁটি মাছের মতো চেহারা নিয়ে! তোকে ওই কাগামাছি আর কদম্ব পাকড়াশি স্রেফ ভেজে খেয়ে ফেলবে, দেখে নিস।

হাবুল সেন বললে—এখন ওইসব কথা ছাড়ান দাও। আইজ বৈকালেই তো বুইড়ার লগে দেখা হইব। তখন দেখা যাইব, কী করন যায়। অখন ফিরা্যা চল, বড়ই ক্ষুধা পাইছে।

টেনিদা দাঁত খিঁচিয়ে কী যেন বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ একটা গগনভেদী চিৎকার। আমাদের সংস্কৃতের প্রফেসার যাকে বলেন 'জীমূতমন্দ্র' কিম্বা 'অম্বরে ডম্বরু'—অনেকটা সেই রকম।

আর কি? সেই বেরসিক নেপালি ড্রাইভার। আমার গানে বাগড়া দিয়েছিল। ড্রাইভার এতক্ষণ নিচে গাড়ি নিয়ে বসেছিল, এইবারে অধৈর্য হয়ে পাহাড় ভেঙে উঠে এসেছে ওপরে।

—আপনাদের মতলব কী স্যার! সারাটা দিন সিঞ্চলেই কাটাতে চান নাকি! তাহলে ভাড়া মিটিয়ে আমায় ছেড়ে দিন, আমি দার্জিলিঙে চলে যাই।

টেনিদা বললে—আর আমরা ফিরে যাব কী করে!

—হেঁটে ঘুমে যাবেন, সেখান থেকে ট্রেন ধরবেন।—পরিষ্কার বাংলায় সাফ গলায় জানিয়ে দিলে ড্রাইভার।

আমি বললুম—থাক, আর উপদেশ দিতে হবে না। আমরা যাচ্ছি।

আমরা চারজনে গুম হয়ে এসে গাড়িতে বসলুম। মাথার ভেতরে সাতকড়ি সাঁতরা, এক গাছে চার রকম ফল ফলানোর বৈজ্ঞানিক গবেষণা, জাপানি বৈজ্ঞানিক কাগামাছি আর ধড়িবাজ কদম্ব পাকড়াশি, এই সবই ঘুরপাক খাচ্ছে তখন। বনের পথ দিয়ে এঁকে বেঁকে আমাদের ল্যাণ্ডরোভার নেমে চলেছে।

আমি বজ্রবাহাদুরের পাশে বসে ছিলুম। হঠাৎ ডেকে জিগগেস করলুম—আচ্ছা ড্রাইভার সাহেব—

—আমি ড্রাইভার নই, গাড়ির মালিক। আমার নাম বজ্র-বাহাদুর।

—আচ্ছা বজ্রবাহাদুর সিং—

—সিং নয় থাপা।

তার মানে শিংওলা নিরীহ প্রাণী নয়, দস্তুরমত থাবা আছে। মেজাজ আর গলার স্বরেই সেটা বোঝা যাচ্ছিল। আমি সামলে নিয়ে বললুম—আপনি নীল পাহাড়ি চেনেন?

বজ্রবাহাদুর বললে—চিনব না কেন? সে তো পুবং-এর কাছেই। আর পুবং-এই তো আমার ঘর।

—তাই নাকি! এবার ক্যাবলা আকৃষ্ট হল—আপনি সেখানকার ঝাউ-বাংলো দেখেছেন?

—দেখেছি বই কি। ম্যাকেঞ্জি বলে একটা বুড়া সাহেব তৈয়ার করেছিল সেটা। তারপর হিন্দুস্তান স্বাধীন হল আর বুড়া সেটাকে বেচে দিয়ে বিলায়েত চলে গেল। এখন কলকাতার এক বাঙালি বাবু তার মালিক।

আমি জিগগেস করলুম—কেমন বাড়ি?

বজ্রবাহাদুর বললে—রামরো ছ।

—রামরো ছ!—হাবুল বললে—অঃ বুঝছি। সেইখানেই

বোধহয় ছয়বার রাম রাম কইতে হয়।

বজ্রবাহাদুরের গোমড়া মুখে এবার একটু হাসি ফুটল—না-না, রাম রাম বলতে হয় না, 'রামরো ছ' হল নেপালি ভাষা। ওর মানে, ভালো আছে। খুব খাসা কুঠি।

ক্যাবলা জিগগেস করলে—ওখানে কে থাকে এখন? কলকাতার সেই বাঙালি বাবু?

—সে আমি জানি না।

—আমরা যদি ওখানে বেড়াতে যাই, কেমন হয়?

বজ্রবাহাদুর আবার বললে—রামরো। আমার গাড়িতে যাবেন, সস্তায় নিয়ে যাব আর পুবং-এর খাঁটি দুধ আর মাখনের বন্দোবস্ত করে দেব।

আমরা যখন স্যানিটারিয়ামে ফিরে এলুম, তখন খাবার ঘণ্টা পড়ো পড়ো। তাড়াতাড়ি চান-টান সেরে খেয়ে দেয়ে নিয়ে ফোয়ারাটার পাশে এসে আমরা কনফারেন্স বসালুম।

—কী করা যায়!

টেনিদা গোটা চল্লিশেক লিচু নিয়ে বসেছিল, খাওয়ার পর ওইটেই তার মুখশুদ্ধি। একটা লিচু টপাৎ করে গালে ফেলে বললে—চুলোয় যাক, আমরা ওসবের ভেতরে নেই। দুদিনের জন্যে দার্জিলিঙে বেড়াতে এসেছি, খামোকা ওসব ঝঞ্ঝাট কে পোয়াতে যায় বাপু! ঘোড়ায় চড়ে বেড়িয়ে-টেড়িয়ে, দিব্যি ওজন বাড়িয়ে ফিরে যাব—ব্যাস!

ক্যাবলা বললে—ভদ্রলোককে সকালে যে কথা দেওয়া হল?

লিচুর আঁটিটা সামনের পাইনগাছে একটা কাককে তাক করে ছুড়ে দিলে টেনিদা—বিকেলে সেকথা ফিরিয়ে নিলেই হল? সবুজ দাড়ি, কাগামাছি! হুঁঃ। যত সব বোগাস!

আমি বললুম—কিন্তু বজ্রবাহাদুর বলছিল, পুবং থেকে খাঁটি

দুধ আর মাখন খাওয়াবে।

টেনিদা আমার পেটে একটা খোঁচা দিয়ে বললে—ধুত্। এটার রাতদিন খাই-খাই—এই করেই মরবে।' দুধ মাখনের লোভে কাগামাছির খপ্পরে গিয়ে পড়ি, আর সে আমাদের আরশোলার চাটনি বানিয়ে ফেলুক!—বলেই আর একটা লিচু গালে পুরে দিলে!

হাবুল মাথা নেড়ে বললে—হ, সেই কথাই ভালো। ঝামেলার মইধ্যে গিয়া কাম নাই।

তখন আমি বললুম—তা হলে থাক। সাতকড়ি সাঁতরাকে দেখে আমারও কেমন সন্দেহজনক মনে হল। কেমন ঝাঁ করে বনের ভেতর লুকিয়ে গেল—দেখলে না!

হাবুল বলল—আমার তো ভূত বইলাই মনে হইতাছে।

ক্যাবলা ভীষণ চটে গেল—দুত্তোর! দিন দুপুরে সিঞ্চল থেকে ভূতের আসতে বয়ে গেছে। আসল কথা, তোমরা সবাই হচ্ছ পয়লা নম্বরের কাওয়ার্ড—হিন্দিতে যাকে বলে একদম ডরপোক!

—কী বললি! কাওয়ার্ড!—টেনিদা হুংকার ছাড়ল। খুব সম্ভব ক্যাবলাকে একটা চাঁটি কশাতে যাচ্ছিল, এমন সময় স্যানিটারিয়ামের এক কাঞ্ছা এসে হাজির। তার হাতে একটা ছোট প্যাকেট।

এসেই বললে—তিমিরো লাই।

টেনিদা বললে—তার মানে? তিমিরো লাই? এই দুপুর বেলা তিমির কোথায় পাব? আর 'লাই' মানে তো শোয়া। খামোকা শুতেই বা যাব কেন?

ক্যাবলা হেসে বলল—না-না—বলছে, তোমাদের জন্যে।

—তাই নাকি?—টেনিদা একটানে প্যাকেট নিয়ে খুলে ফেলল। আর তার ভেতর থেকে বেরিয়ে এল একটি মস্ত চকোলেট।

—চকোলেট? কে দিলে?

কাঞ্ছা আবার নেপালি ভাষায় জানালে একটু আগেই সে 'মাথি' অর্থাৎ উপরে বাজারে গিয়েছিল। সেখানে সরু গোঁফ আর গলায়

মেটে রঙের মাফলার জড়ানো একটি লোকের সঙ্গে তার দেখা হয়। সে তার হাতে এইটে দিয়ে বলে, কলকাতা থেকে যে চারজন ছোকরা বাবু এসেছে তাদের কাছে যেন পৌঁছে দেয়।

সরু গোঁফ, মেটে রঙের মাফলার! তা হলে—

টেনিদা একটানে চকোলেটটা খুলে ফেলল। টুপ করে মাটিতে পড়ল চার ভাঁজ করা একটি চিরকুট। তাতে লেখা:

'যাচ্ছ না তো নীল পাহাড়ি
অকর্মা সব ধাড়ি ধাড়ি!
এতেই প্রাণে লাগল ত্রাস?
গড়ের মাঠে খাওগে ঘাস।'

হাবুল সুর করে কবিতাটা পড়ল। আর আমরা তিনজন একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলুম—কদম্ব পাকড়াশি!

কিছুক্ষণ চুপচাপ। টেনিদা গম্ভীর। একটা লিচু ছাড়িয়ে মুখের কাছে সেই থেকে ধরে রয়েছে, কিন্তু খাচ্ছে না। টেনিদার এমন আশ্চর্য সংযম এর আগে আমি কোনোদিন দেখি নি।

ক্যাবলা বলল—টেনিদা এবার?

টেনিদার নাকের ভেতর থেকে আওয়াজ বেরুল—হুম!

—আমাদের অকর্মার ধাড়ি বলেছে। গড়ের মাঠে গিয়ে ঘাস খাবার উপদেশ দিয়েছে।

হাবুল সেন বললে—হ, শত্রুতে চ্যালেঞ্জ কইরা পাঠাইছে।

ক্যাবলা আবার বললে—কদম্ব পাকড়াশির কাছে হার মেনে কলকাতায় ফিরে যাবে টেনিদা? গিয়ে গড়ের মাঠে ঘাস খাবে ?

টেনিদা এবারে চিৎকার করে উঠল—কভি নেই। নীল পাহাড়িতে যাবই।

—আলবাত?

—আলবাত!—বলেই টপাত করে লিচুটা মুখে পুরে দিলে। আমার মনটা চকোলেটের জন্য ছোঁক ছোঁক করছিল বললুম—তা

হলে কদম্ব পাকড়াশির চকোলেটটা ভাগযোগ করে—

টেনিদা সংক্ষেপে বললে—শাট আপ !

বিকেল পাঁচটার সময় আমরা গিয়ে হাজির হলুম ন্যাচারাল মিউজিয়ামের কাছে সেই পার্কটায়।

যারা বেড়াতে বেরিয়েছে, সবাই গিয়ে ভিড় করেছে ম্যালে। সামনে দিয়ে টকাটক করে ঘোড়া ছুটে যাচ্ছে বার্চ হিলের দিকে। প্রায় ফাঁকা পার্কে আমরা চারজন ঘুঘুর মতো একটা বেঞ্চিতে অপেক্ষা করে আছি। এইখানেই সেই সবুজ দাড়িওলা সাতকড়ি সাঁতরার আসবার কথা।

দশ-পনেরো-বিশ মিনিট কাটল, বসে আছি তো বসেই আছি। চার আনার চিনেবাদাম শেষ হয়ে পায়ের কাছে ভাঙা খোলার একটা পাহাড় জমেছে। সাতকড়ির আর দেখা নেই।

টেনিদা বিরক্ত হয়ে বললে—কই রে ক্যাবলা, সে সবুজদাড়ি গেল কোথায় ?

হাবুল বললে—কইলাম না, ওইটা সিঞ্চল পাহাড়ের ভূত ! বনের ভূত বনে গেছে, এইখানে আর আইবো না।

ক্যাবলা বললে—ব্যস্ত হচ্ছে কেন ! একটু দেখাই যাক না। আমার মনে হয় ভদ্রলোক নিশ্চয়ই আসবেন !

ঠিক তখন পেছন থেকে কে বললে—এই তো এসে গেছি।

আমরা চমকে দাঁড়িয়ে পড়লুম। পার্কে সন্ধ্যার ছায়া নেমেছে। তার ওপর বেশ করে কুয়াশা ঘনিয়েছে। এই পার্কটা যেন চারদিকের পৃথিবী থেকে আলাদা হয়ে গেছে এখন। আর এরই মধ্যে সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন সেই লোকটা ! মাথায় বাঁদুড়ে টুপি, চোখে নীল চশমা।

টেনিদা কী বলতে যাচ্ছিল, ভদ্রলোক ঠোঁটে আঙুল দিলেন।

—স্—সস্। আশপাশেই কাগামাছির চর ঘুরেছে। কাজের



কথা সংক্ষেপে বলে নিই। তোমারা নীল পাহাড়িতে যাচ্ছে তো ?

টেনিদা বললে—যাচ্ছি।

—কাল সকালে ?

—কাল সকালে।

ভদ্রলোক চাপাগলায় বললেন—ঠিক আছে। মোটর ভাড়া করে চলে যেয়ো, ঘণ্টা দেড়েক লাগবে। ওখানে গিয়ে পাহাড়ি বস্তিতে জিগ্‌গেস করলেই ঝাউ-বাংলো চিনিয়ে দেবে এখন। আর তোমরা আমার গেস্ট হবে। মোটর ভাড়াও আমি দিয়ে দেব এখন। রাজি ?

হাবুল বললে—হ, রাজি।

—তাহলে আমি চলি। দাঁড়াবার সময় নেই। কালই ঝাউ-বাংলোয় দেখা হবে। আর একটা কথা মনে রেখো। ছুঁচোবাজি।

—ছুঁচোবাজি? আমি আশ্চর্য হয়ে জিগগেস করলুম—ছুঁচো বাজি আবার কী?

—কাগামাছির সংকেত! আচ্ছা চলি। টা-টা—

বলেই ভদ্রলোক ঝাঁ করে চলে গেলেন, কুয়াশার ভেতর দিয়ে কোন দিকে যে গেলেন ভালো করে ঠাহরও পাওয়া গেল না।

ক্যাবলা উঠে দাঁড়াল সংগে সংগেই।

—চলো টেনিদা।

—কোথায়?

—মোটর স্ট্যাণ্ডে। বজ্রবাহাদুরের গাড়িটা ঠিক করতে হবে।

বলতে না বলতেই ফড়্—ফড়্—ফড়-ড়াং করে আওয়াজ উঠল একটা। আর হাবুলের ঠিক কানের পাশ দিয়ে একটা ছুঁচোবাজি এসে পড়ল সামনের ঘাসের ওপর—আগুন ঝরিয়ে তিড়িক তিড়িক করে নাচতে নাচতে ফটাত্ শব্দে একটা ফরগেট-মি-নটের ঝাড়ের মধ্যে অদৃশ্য হল।

॥ ৫ ॥

ঝাউ-বাংলোয়

আমরা কজনে হাঁ করে সেই ছুঁচোবাজির নাচ দেখলুম। তারপর ঝোপের মধ্যে ঢুকে যখন সেটা ফুস করে নিবে গেল তখনো কারুর মুখে একটা কথা নেই। পার্কটা তখন ফাঁকা, ঘন শাদা কুয়াশায় চারদিক ঢাকা পড়ে গেছে, আশে পাশে যে আলোগুলো জ্বলে উঠেছিল, তারাও সেই কুয়াশার মধ্যে ডুব মেরেছে। আর আমরা চারজন যেন কোনো রোমাঞ্চকর গোয়েন্দা-কাহিনীর মধ্যে বসে আছি।

টেনিদাই কথা কইল প্রথম।

—হাঁ রে, এটা কী হল বল দিকি?

হাবুল একটা চিনেবাদাম মুখে দিয়ে গিলতে গিয়ে বিষম খেল। খানিকক্ষণ খক খক করে কেশে নিয়ে বললে—এইটা আর বুঝতে পারলা না? সেই কদম্ব পাকড়াশি আমাগো পিছে লাগছে।

আমি বললুম—হয়তো বা কাগামাছি নিজেই এসে ছুড়ে দিয়েছে ওটা।

টেনিদা বলল—ধুত্তোর, এ তো মহা ঝামেলায় পড়া গেল! কোথায় গরমের ছুটিতে দিব্যি কদিন দার্জিলিঙে বেড়িয়ে যাব, কোত্থেকে সেই মিচকে পটাশ লোকটা এসে হাজির হল। তারপর আবার সবুজদেড়ে সাতকড়ি সাঁতরা—কী এক জাপানি বৈজ্ঞানিক কাগামাছি না বগাহাঁচি—ভালো লাগে এসব?

হাবুল দুঃখ করে বললে—বুঝলা না, আমাগো বরাতই খারাপ। সেইবারে ঝন্টি পাহাড়িতে বেড়াইতে গেলাম—কোথিকা এক

বিকট ঘুটঘুটানন্দ জুটল।

ক্যাবলা বললে—তাতে ক্ষেতিটা কী হয়েছিল শুনি? ওদের দলটাকে ধরিয়ে দিয়ে সবাই একটা করে সোনার মেডেল পাওনি?

টেনিদা মুখটাকে আলুকাবলির মতো করে বললে,—আরে রেখে দে তোর সোনার মেডেল। ঘুটঘুটানন্দ তবু বাঙালি, যাহোক একটা কায়দা করা গিয়েছিল। আমি ডিটেকটিভ বইতে পড়েছি, এ সব জাপানিরা খুব ডেঞ্জারাস্ হয়।

হাবুল মাথা নেড়ে বললে,—হ-হ-আমিও পড়ছি সেই সব বই। আমাগো ধইরা ধইরা পুটুত পুটুত কইরা এক একখান ইন্‌জেকশন দিবো, আর আমরা ভাউয়া ব্যাঙের মতো চিতপটাং হইয়া পইড়্যা থাকুম। তখন আমাগো মাথার খুলি ফুটা কইর‍্যা তার মইধ্যে বান্দরের ঘিলু ঢুকাইয়া দিবো।

আমি বললুম,—আর তক্ষুনি আমাদের একটা করে ল্যাজ বেরুবে, আমরা লাফ দিয়ে গাছে উঠে পড়ব, তারপর কিচমিচ করে কচি পাতা খেয়ে বেড়াব। আর আমাদের টেনিদা—

হাবুল বললে—পালের গোদা হইব। যারে কয় গোদা বান্দর।

ধাঁই করে টেনিদা একটা গাঁট্টা বসিয়ে দিলে হাবুলের চাঁদির ওপর। দাঁত খিঁচিয়ে বললে—গুরুজনের সঙ্গে ইয়ার্কি? আমি মরছি নিজের জ্বালায় আর এগুলো সব তখন থেকে ফাজলামো করছে! অ্যাই—ভাউয়া ব্যাঙ মানে কিরে?

হাবুল বললে—ভাউয়া ব্যাঙ! ভাউয়া ব্যাঙরে কয় ভাউয়া ব্যাঙ।

ক্যাবলা বিরক্ত হইয়া বলল—আরে ভেইয়া আব উস বাতচিত ছোড় দো। লেকিন টেনিদা, আমার একটা সন্দেহ হচ্ছে।

—কী সন্দেহ শুনি?

—আমার মনে হল ঐ বুড়োটাই ছুঁচোবাজি ছেড়েছে।

আমরা তিনজনে একসঙ্গে চমকে উঠলুম।

—সে কী?

—আমার যেন তাই মনে হল। বুড়ো ওঠবার আগে নিজের পকেটটা হাঁটকাচ্ছিল, একটা দেশলাইয়ের খড়খড়ানিও যেন শুনেছিলুম।

আমি বললুম—তবে বোধ হয় ওই বুড়োটাই—

হাবুল ফস করে আমার কথাটা কেড়ে নিয়ে বললে—কাগামাছি।

টেনিদা মুখটাকে ডিমভাজার মতো করে নিয়ে বললে তোদের মুণ্ডু। ও নিজেই যদি কাগামাছি হবে, তাহলে কাগামাছির নামে ভয় পাবে কেন? আর আমাদের ঝাউবাংলোয় যেতে নেমন্তন্নই বা করবে কেন?

হাবুল আবার টিকটিক করে উঠল—প্যাটে ইন্‌জেকশন দিয়া দিয়া ভাইয়া ব্যাঙ বানাইয়া দিবো, সেই জন্য।

—ফের ভাউয়া ব্যাঙ! টেনিদা আবার হুঙ্কার ছাড়ল—যদি ভাউয়া ব্যাঙ-এর মানে বলতে না পারিস—

—ভাউয়া ব্যাঙ-এর মানে হইল গিয়া ভাউয়া ব্যাঙ।

টেনিদা একটা লম্বা হাত বাড়িয়ে হাবুলের কান পাকড়াতে যাচ্ছিল, হাবুল তিড়িং করে লাফিয়ে সরে গেল—ভাউয়া ব্যাঙ-এর মতনই লাফান খুব সম্ভব! আর ক্যাবলা দারুণ বিরক্ত হল।

—তোমরা কি বসে বসে সমানে বাজে কথাই বলবে নাকি? ঝাউ-বাংলোতে যাবার ব্যবস্থা করতে হবে না?

টেনিদা দমে গেল।

—যেতেই হবে?

ক্যাবলা বললে,—যেতেই হবে। কদম্ব পাকড়াশি দু নম্বর চকোলেট পাঠিয়ে ভিতু বলে ঠাট্টা করে গেল—ছুঁচোবাজি ছেড়ে আমাদের চ্যালেঞ্জ করলে, সেগুলো বেমালুম হজম করে চলে যাব? আমাদের পটলডাঙার প্রেসটিজ নেই একটা?

আমি আর হাবুল বললুম—আলবত!

—ওঠো তাহলে। বজ্র বাহাদুরের গাড়িটাই ঠিক করে আসি। কাল ভোরেই তো বেরুতে হবে।

সত্যি কথা বলতে কি, আমি ভালো করে ঘুমুতে পারলুম না। রাত্তিরে মাংসটা একটু বেশিই খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। অনেকক্ষণ ধরে শরীরটা হাঁইফাঁই করতে লাগল। তারপর স্বপ্ন দেখলুম, একটা মস্ত কালো দাঁড়কাক আমার মাথার কাছে বসে টপটপ করে মাছি খাচ্ছে, একটা একটা করে ঠোক্কর দিচ্ছে আমার চাঁদিতে। আর ফ্যাক্ ফ্যাক্ করে বুড়ো মানুষের মতো বলছে—যাও না একবার নীল পাহাড়ি, তারপর কী হাঁড়ির হাল করি দেখে নিয়ো।

আঁকপাঁক করে জেগে উঠে দেখি, পুরো বত্রিশটা দাঁত বের করে হাবুল সেন দাঁড়িয়ে। তার হাতে একটা সন্দেহজনক পেনসিল। তখন আমার মনে হল, দাঁড়কাক নয়, হাবুলই পেনসিল দিয়ে আমার মাথায় ঠোকর দিচ্ছিল।

বললুম—এই হাবলা কী হচ্ছে?

হাবুল বললে,—চায়ের ঘণ্টা পইড়্যা গেছে। রওনা হইতে হইবো না নীল পাহাড়িতে? তরে জাগাইতে আছিলাম।

—তাই বলে মাথায় পেনসিল দিয়ে ঠুকবি?

হাবুলের বত্রিশটা দাঁত চিকচিক করে উঠল—বোঝস্ নাই, এক্স্পেরিমেণ্ট করতাছিলাম।

—আমার মাথা নিয়ে তোর কিসের একসপেরিমেণ্ট শুনি?

—দেখতাছিলাম, কয় পার্সেণ্ট গোবর আর কয় পার্সেণ্ট ঘিলু।

কী ধড়িবাজ, দেখেছ একবার! আমি দারুণ চটে বললুম—তার চাইতে নিজের মাথাটাই বরং ভালো করে বাজিয়ে নে। দেখবি গোবর—সেণ্ট পারসেণ্ট!

—চ্যাতস ক্যান? চা খাইয়া মাথা ঠাণ্ডা করবি, চল।

টেনিদা আর ক্যাবলা আগেই চায়ের টেবিলে গিয়ে জুটেছিল,

আমিও গেলুম হাবুলের সংগে। চা শেষ না হতেই খবর এল, বজ্রবাহাদুর তার গাড়ি নিয়ে হাজির।

ক্যাবলা বললে—নে, ওঠ ওঠ। আর গরুর মতো বসে বসে টোস্ট্ চিবুতে হবে না।

—নিজেরা তো দিব্যি খেলে, আর আমার বেলাতেই—

—আটটা পর্যন্ত ঘুমুতে কে বলেছিল, শুনি?—টেনিদা হুঙ্কার ছাড়ল।

কথা বাড়িয়ে লাভ নেই, ওরাই দলে ভারি। টোস্টটা হাতে নিয়েই উঠে পড়লুম। সন্দেশ দুটাও ছাড়ি নি, ভরে নিলুম জামার পকেটে। যাচ্ছি সেই নীলপাহাড়ির রহস্যময় ঝাউ-বাংলোয়, বরাতে কী যে আছে কে জানে। যদি বেঘোরে মারাই যেতে হয়, তাহলে মরবার আগে অন্তত সন্দেশ দুটো তো খেয়ে নিতে পারব।

শেষ পর্যন্ত আমরা আমাদের দুর্দান্ত অ্যাডভেঞ্চারে বেড়িয়ে পড়লুম। আরো আধঘণ্টা পরেই।

দার্জিলিং রেল স্টেশনের পাশ থেকে আমাদের গাড়িটা ছাড়তেই টেনিদা হাঁক ছাড়ল—পটলডাঙা—

আমরা তিনজন তক্ষুনি শেয়ালের মতো কোরাসে বললুম: —জিন্দাবাদ!

বজ্রবাহাদুর স্টিয়ারিং থেকে মুখ ফেরাল। তারপর তেমনি পরিষ্কার বাংলায় জিজ্ঞেস করলে—কী জিন্দাবাদ বললেন?

চারজনে একসংগে জবাব দিলুম—পটলডাঙা।

—সে আবার কী?

লোকটা কী গেঁয়ো, আমাদের পটলডাঙার নাম পর্যন্ত শোনেনি! আর সেখানকার বিখ্যাত চারমূর্তি যে তার গাড়িতে চেপে একটা রোমহর্ষক অ্যাডভেঞ্চারে চলেছি, তা-ও বুঝতে পারছে না!

টেনিদা মুখটাকে স্রেফ গাজরের হালুয়ার মতো করে বললে:

—পটলডাঙা আমাদের মাদারল্যাণ্ড।

হাবুল বললে—উঁহু, ঠিক কইলা না। মাদারপাড়া।

—ওই হল, মাদারপাড়া। যাকে বলে—

ক্যাবলা বললে—ডি-লা গ্র্যাণ্ডি মেফিস্টোফিলিস।

বজ্রবাহাদুর কিছুক্ষণ হাঁ করে চেয়ে রইল, কী বুঝল সে-ই জানে। তারপর নিজের মনে কী একবার বিড় বিড় করে বলে গাড়ি চালাতে লাগল।

আমরাও মন দিয়ে প্রকৃতির শোভা দেখতে লাগলুম বসে বসে। পাহাড়ের বুকের ভেতর দিয়ে বাঁকে বাঁকে পথ চলেছে, কখনো চড়াই কখনো উতরাই। কত গাছ, কত ফুল, কোথাও চা বাগান, কোথাও দুধের ফেনার মতো শাদা শাদা ঝরনা পথের তলা দিয়ে নিচে কুয়াশা-ঢাকা খাদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। ঘুম বাঁ-দিকে রেখে পেশক রোড ধরে আমরা তিস্তার দিকে এগিয়ে চলেছি।

আমার গলায় আবার গান আসছিল, 'এমন শুভ্র নদী কাহার, কোথায় এমন ধূম্র পাহাড়'—কিন্তু বজ্রবাহাদুরের কথা ভেবেই সেই আকুল আবেগটা আমাকে ঠেকিয়ে রাখতে হল। একেই লোকটার মেজাজ চড়া, তার ওপর 'ডি-লা গ্র্যাণ্ডি মেফিস্টোফিলিস' শুনেই চটে রয়েছে। ওকে আর ঘাঁটানোটা ঠিক হবে না। পুবং-এর ঘি-দুধ খাওয়াবে বলেছে, তা-ছাড়া গাড়ি তো ওরই হাতে। আমার গানের সুরে খেপে গিয়ে যদি একটু বাঁ দিকে গাড়িটা নামিয়ে দেয়, তা হলেই আর দেখতে হবে না। হাজার ফুট খাদ হা-হা করছে সেখানে।

হঠাৎ ক্যাবলা বললে—আচ্ছা টেনিদা?

—হুঁ।

—যদি গিয়ে দেখি সবটাই বোগাস?

—তার মানে?

—মানে, ঝাউ-বাংলোয় সাতকড়ি সাঁতরা বলে কেউ নেই? ওই

সবুজ দাড়িওয়ালা লোকটা আমাদের ঠকিয়েছে? রসিকতা করেছে আমাদের সঙ্গে?

টেনিদার সেজন্য কোনো দুশ্চিন্তা দেখা গেল না। বরং খুশি হয়ে বললে—তাহলে তো বেঁচেই যাই। হাড়হাবাতে কাগামাছির পাল্লায় আর পড়তে হয় না।

হাবুল বললে—কষ্টডাই সার হইবো।

—কষ্ট আবার কিসের? বজ্রবাহাদুরের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে টেনিদা বললে—পুবং-এর ছানা তাহলে আছে কী করতে?

গাড়িটা এবার ডান দিকে বাঁক নিলে। পথের দুধারে চলল সারবাঁধা পাইনের বন, টাইগার ফার্নের ঘন ঝোপ, থরে থরে শানাই ফুল। রাস্তাটা সরু—ছায়ায় অন্ধকার, আর রাশি রাশি রাশি প্রজাপতি উড়ছে। অত প্রজাপতি একসংগে আমি কখনো দেখিনি। দার্জিলিং থেকে অন্তত মাইল বারো চলে এসেছি বলে মনে হল।

বজ্রবাহাদুর মুখ ফিরিয়ে বললে—নীলপাহাড়ি এরিয়ায় এসে গেছি আমরা।

নীলপাহাড়ি! আমরা চারজনেই নড়ে উঠলুম।

ঠিক তক্ষুনি ক্যাবলা বললে—টেনিদা, দেখেছ? ওই পাথরটার গায়ে খড়ি দিয়ে কী লেখা আছে?

গলা বাড়িয়ে আমরা দেখতে পেলুম, বড়ো বড়ো বাংলা হরফে লেখা: **ছুঁচোবাজি।**

সঙ্গে সংগেই আর একটা পাথরের দিকে আমার চোখ পড়ল। তাতে লেখা: **কুণ্ডুমশাই।**

হাবুল চেঁচিয়ে উঠল—আরে, এইখানে আবার লেইখ্যা রাখছে:

হাঁড়িচাচা।

টেনিদা বললে—ড্রাইভার সায়েব, গাড়ি থামান! শিগগির!

বজ্রবাহাদুর কটমট করে তাকাল—আমি ড্রাইভার নই, মালিক।

—আচ্ছা, আচ্ছা, তা-ই হল। থামান একটু।



—থামাচ্ছি। বলে তক্ষুনি থামল না বজ্রবাহাদুর। গাড়িটাকে আর এক পাক ঘুরিয়ে নিয়ে ব্রেক কষল। তারপর বললে—নামুন, এই তো ঝাউ-বাংলো।

আমরা অবাক হয়ে দেখলুম, পাশেই একটা ছোট টিলার মতো; উঁচু জায়গা, পাথরের অনেকগুলো সিঁড়ি উঠেছে সেইটে বেয়ে; আর সিঁড়িগুলো যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে পাইন আর ফুলবাগানে ঘেরা চমৎকার একটি বাংলো। ছবির বইতে বিলিতি ঘরদোরের চেহারা যেমন দেখা যায়, ঠিক সেই রকম। চোখ যেন জুড়িয়ে গেল।

আমরা আরো দেখলুম, চোখে নীল গগল্‌স, বাঁদুরে টুপিতে মাথা মুখ ঢাকা, গায়ে ওভারকোট আর হাতে একটা লাঠি নিয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে আছেন সাতকড়ি সাঁতরা।

বাঁদুরে টুপির ভেতর থেকে ভরাট মোটা গলার ডাক এল—এসো এসো! খোকাবা, এসো! আমি তোমাদের জন্য সেই কখন থেকে অপেক্ষা করে আছি!

আর সেই সময় একটা দমকা হাওয়া উঠল, কী একটা কোত্থেকে খরখর করে আমার মুখে এসে পড়ল। আমি থাবা দিয়ে পাকড়ে নিয়ে দেখলুম, সেটা আর কিছুই নয়—চকোলেটের মোড়ক!



॥ ৬ ॥

বিনামূল্যে ফিল্ম শো !

বজ্র বাহাদুর পাড়ি নিয়ে পুবং-এ চলে গেল।

যাওয়ার আগে বলে গেল, কাল সকালে সে আবার আসবে। আমরা যদি কোথাও বেড়াতে যেতে চাই, নিয়ে যাবে। টেনিদা কিন্তু আসল কথা ভোলে নি। চেঁচিয়ে বললে—বাঃ, পুবং-এর মাখন ?

—দেখা যাক।—বলে বজ্র বাহাদুর হেসে চলে গেল। ওর ট্যাক্সিভাড়াটা সাতকড়ি সাঁতরা আগেই মিটিয়ে দিয়েছিলেন।

আমরা চারজনে ঝাউ-বাংলোয় গিয়ে উঠলুম। সত্যি, বেড়ে জায়গা ! চারদিক পাইন গাছে ঘেরা, নানা রকমে ফুলে ভরে আছে বাগান, কুলকুল করে একটা ঝরনাও বয়ে যাচ্ছে আবার। এ সব মনোরম দৃশ্য-টৃশ্যতো আছেই, কিন্তু তার চাইতেও সেরা বাংলোর ভেতরটা। সোফা-টোফা দেওয়া মস্ত ড্রয়িংরুম, কত রকম ফার্নিচার, দেওয়ালে কত সব বিলিতি ছবি !

সাতকড়ি আমাদের একতলা দোতলা সব ঘুরিয়ে দেখালেন। তারপর দোতালার এক মস্ত হলঘরে নিয়ে গিয়ে বললেন—এইটে তোমাদের শোবার ঘর। কেমন, পছন্দ হয় ?

পছন্দ বলে পছন্দ ! প্রকাণ্ড ঘরটায় চারখানা খাটে বিছানা পাতা, একটা ড্রেসিং টেবিল, দুটো পোশাকের আলমারি (ক্যাবলা বললে, ওয়ার্ডরোব), একটা মস্ত টেবিলের দুদিকে চারখানা চেয়ার, টেবিলের ওপরে ফুলদানি, পাশে চানের ঘর। আমি লক্ষ করে দেখলুম বইয়ের শেলফও রয়েছে একটা তাতে অনেকগুলো ছবিওলা

বিলিতি মাসিক পত্রিকা। ঘরটার তিন দিকে জানলা, তাই দিয়ে এনতার পাহাড়-জংগল আর দূরের চা বাগান দেখা যায়।

সাতকড়ি বললেন—ওই চা বাগানটা দেখছ? ওর একটা ভারি মজার নাম আছে।

আমরা জিগগেস করলুম—কী নাম?

—রংলি রংলিওট!

—কী দারুণ নাম! টেনিদা চমকে উঠল—মানে কী ওর?

হাবুল পণ্ডিতের মতো মাথা নাড়ল?—এইটা আর বুঝতে পারলা না? তার মানে হইল, মায়ে পোলারে ডাইক্যা কইতাছে—এই রংলি, সকাল হইছে, আব শুইয়া থাকিস না। উইঠ্যা পড়, উইঠ্যা পড়।

সাতকড়ি সাঁতরা তার সবুজ দাড়িতে তা দিয়ে হাসলেন। বললেন—না, ওটা পাহাড়ি ভাষা। ওর মানে হল, 'এই পর্যন্তই, আর নয়।'

—অদ্ভুত নাম তো! এ নাম কেন হল?—আমি জানতে চাইলুম।

—সে একটা গল্প আছে, পরে বলব। আর ওই চা-বাগানের ওপারে যে পাহাড়টা দেখছ, তার নাম মংপু!

—মংপু!—ক্যাবলা চেঁচিয়ে উঠল—ওখানেই বুঝি রবীন্দ্রনাথ এসে থাকতেন?

—ঠিক ধরেছ।—সাতকড়ি হাসলেন।—সেই জন্যেই তো ওই পাহাড়টা চোখে পড়লেই আমরা সব গোলমাল হয়ে যায়। ধরো, খুব একটা জটিল বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখছি, যেই মংপুর দিকে তাকিয়েছি—ব্যস!

—ব্যস! হাবুল বললে—অমনি কবিতা আইসা গেল?

—গেল বইকি। তর তর করে লিখতে শুরু করে দিলুম। আমার মনে পড়ে গেল। সিঙ্কলে বসে কবিতা শুনিয়েছিলেন

সাতকড়ি—ওগো পাইন! ঝলমল করছে জ্যোৎস্না, দেখাচ্ছে কী ফাইন।

টেনিদা বললে—তাহলে তো প্যালাকে নিয়ে মুশকিল হবে। ওর আবার একটু কাব্যিরোগ আছে, রাত জেগে কবিতা লিখতে শুরু করে না দেয়। যদিও অঙ্কে বারো-টারোর বেশি পায় না, তবে কবিতা নেহাত মন্দ লেখে না।

কাব্যি রোগের কথা শুনে মন্দ লাগে নি, কিন্তু অঙ্কে বারোর কথা শুনেই মেজাজটা দারুণ খিঁচড়ে গেল। আমি নাক মুখ কুঁচকে বিচ্ছিরিভাবে দাঁত বের করে বললুম—আর তুমি? তুমি ইংরেজিতে সাড়ে সাত পাও নি? তুমি পণ্ডিত মশাইকে ধাতুরূপ বলো নি, গৌ-গৌবৌ-গৌবর?

—ইয়ু প্যালা, শাট আপ।—বলে টেনিদা আমায় মরতে এল, কিন্তু মাঝখানে হাঁ হাঁ করে সাতকড়ি ওকে থামিয়ে দিলেন—আহা-হা এখন এ-সব গৃহযুদ্ধ কেন? লড়াই করবার সময় অনেক পাবে, কাগামাছি তো আছেই।

সেই বিদঘুটে কাগামাছি! শুনেই মন খারাপ হয়ে গেল। এতক্ষণ বেশ ছিলুম, দিব্যি প্রাকৃতিক শোভাটোভা দেখা হচ্ছিল, হঠাৎ অলক্ষুনে কাগামাছির কথা শুনে খুব খারাপ লাগল।

টেনিদা বললে—জানেন, কাল আপনি চলে আসবার পরেই পার্কের ভেতর কে একটা ছুঁচোবাজি ছুড়েছিল।

—অ্যাঁ, তবে ওর গুপ্তচর ওখানেও ছিল! সাতকড়ি একটা খাবি খেলেন। —লোকটা নিশ্চয় কদম্ব পাকড়াশি।

—আসবার সময় দেখলাম, একজায়গায় খড়ি দিয়ে পাথরের গায়ে লেখা আছে—'কুণ্ডুমশাই'।—আমি জানালুম।

—আর একখানে লেইখ্যা রাখছে—'হাঁড়িচাঁচা'। হাবুল সংবাদ সরবরাহ করল।

—ওফ্! আর বলতে হবে না!—সাতকড়ি বললেন—তবে তো



শত্রু এবার দস্তুরমতো আক্রমণ করবে। আমার ফরমুলাটা বুঝি আর কাগামাছির হাত থেকে বাঁচানো যাবে না।

সাতকড়ি হাহাকার করতে লাগলেন।

ক্যাবলা বললে—তাহলে পুলিশে খবর দিলেই তো—

—পুলিশ! সাতকড়ি মাথা নাড়লেন।—পুলিশ কিছু করতে পারবে না। বন্ধুগণ, তোমরাই আমার ভরসা। বাঁচাবে না আমাকে, সাহায্য করবে না আমাকে?

বলতে-বলতে তাঁর চোখে প্রায় জল এসে গেল।

ওঁর অবস্থা দেখে আমার বুকের ভেতরটা প্রায় হায়-হায় করতে লাগল, মনে হল, দরকার পড়লে প্রাণটা পর্যন্ত দিয়ে দিতে পারি।

এমনকি, টেনিদা পর্যন্ত করুণস্বরে বললে—কিছু ভাববেন না সাতকড়িবাবু, আমরা আছি।

হাবুলও একটা ঘোরতর কিছু বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় সাতকড়িবাবুর কাঞ্ছা এসে খবর দিলে, খানা তৈরি।

এটা সুখবর। দার্জিলিঙের রুটি ডিম অনেক আগেই রাস্তায় হজম হয়ে গিয়েছিল। আর সত্যি কথা বলতে কি, সাতকড়িবাবুর রান্নাঘর থেকে মধ্যে মধ্যে এক একটা বেশ প্রাণকাড়া গন্ধের ঝলক এসে থেকে থেকে আমাদের উদাস করেও দিচ্ছিল বই কি!

সারাটা দিন বেশ কাটল। প্রচুর খাওয়া-দাওয়া হল, দুপুরে সাতকড়িবাবু অনেক কবিতা-টবিতা শোনালেন। সেই ফরমুলাটার কথা বললেন—যা দিয়ে একটা গাছে আম কলা আঙুর আপেল সব একসঙ্গে ফলানো যায়। আমি একবার ফরমুলাটা দেখতে চেয়েছিলুম, তাতে বিকট ভ্রূকুটি করে সাতকড়ি বাবু আমার দিকে তাকালেন।

—এনসাইক্লোপিডিক ক্যাটাস্ট্রফি বোঝো?

সর্বনাশ! নাম শুনেই পিলে চমকে গেল। আমি তো আমি স্কুল ফাইনালে স্কলারশিপ পাওয়া ক্যাবলা পর্যন্ত থই পেল বলে মনে হল না।

—প্রাণতোষিণী মহাপরিনির্বাণ-তন্ত্রের পাতা উলটেছ কোনদিন?

টেনিদা আঁতকে উঠে বললে—আজ্ঞে না। ওলটাতে চাই না।

—নেবু চাড্‌নাজার আর পজিট্রনের কম্বিনেশন কী জানো?

—জানি না।

—থিয়োরি অব রিলেটিভিটির সংগে অ্যাকোয়া টাইকোটিস যোগ করলে কী হয় বলতে পারো?

—হাবুল বললে—খাইছে!

মিটি মিটি হেসে সাতকড়ি বললেন—তাহলে ফরমুলা দেখে তো

কিছু বুঝতে পারবে না।

ক্যাবলা মাথা চুলকোতে লাগল। একটু ভেবে-চিন্তে বললে—দেখুন—কী বলে, অ্যাকোয়া টাইকোটিস মানে তো জোয়ানের আরক—তাই নয়? তা জোয়ানের আরকের সংগে থিয়োরি অফ রিলেটিভিটি—

—ওই তো আমার গবেষণার রহস্য!—সাতকড়ি আবার মিটমিট করে হাসলেন—ওটা বুঝলে তো ফরমুলাটা তুমিই আবিষ্কার করতে পারতে!

টেনিদা বললে—নিশ্চয়-নিশ্চয়! ক্যাবলার কথায় কান দেবেন না। সব জিনিশেই ওর সব সময় টিকটিক করা চাই। এই ক্যাবলা, ফের যদি তুই ওস্তাদি করতে যাবি, তাহলে এক চড়ে তোর কান—

আমি বললুম—কানপুরে উড়ে যাবে।

সাতকড়ি বললে—আহা থাক, থাক, নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করতে নেই। যাক বিকেল তো হল, তোমরা এখন চা-টা খেয়ে একটু ঘুরে এসো—,কেমন? রাত্তিরে আবার গল্প করা যাবে।

সাতকড়ি উঠে গেলেন।

আমরা বেড়াতে বেরুলুম। বেশ নিরিবিলি জায়গাটি, গ্রামে লোকজন অল্প, পাহাড়-জংগল-ফুল আর ঝরনায় ভরা। থেকে থেকে ফগ ঘনিয়ে আসছে আবার মিলিয়ে যাচ্ছে। দূরে সমতলের একটুখানি সবুজ রেখা দেখা যায়, সেখানে একটা রুপোলি নদী চিকচিক করছে। একজন পাহাড়ি বললে—ওটা তিস্তা ভ্যালি।

সত্যি দার্জিলিঙের ভিড় আর হট্টগোলের ভেতর থেকে এসে মন যেন জুড়িয়ে গেল। আর মংপুর পাহাড়টাকে যতই দেখছিলুম, ততই মনে হচ্ছিল—এখানে থাকলে সবাই-ই কবি হতে পারে, সাতকড়ি সাঁতরার কোনো দোষ নেই। কেবল হতভাগা কাগামাছিটাই যদি না থাকত—

কিন্তু কোথায় কাগামাছি! আশপাশে কোথাও তার টিকি কিংবা টাক-ফাক-কিছু আছে বলে তো বোধ হচ্ছে না। তাহলে পাথরের গায়ে খড়ি দিয়ে ও সব লিখলই বা কে! কে জানে!

রাত হল, ড্রয়িং রুমে বসে আবার আমরা অনেক গল্প করলুম। সাতকড়ি আবার একটা বেশ লম্বা কবিতা আমাদের শোনালেন—আমরা বেড়াতে বেরুলে ওটা লিখেছেন। তার কয়েকটা লাইন এই রকম—

ওগো শ্যামল পাহাড়—
তোমার কিবা বাহার,
আমার মনে জাগাও দোলা
করো আমায় আপন ভোলা
তুমি আমার ভাবের গোলা
জোগাও প্রাণের আহার—!

টেনিদা বললে—পেটের আহার লিখলেও মন্দ হত না।

সাতকড়ি বললেন—তা-ও হত। তবে কি না 'পেটের আহার'টা কবিতায় ভালো শোনায় না।

হাবুল জানাল—ভাবের গোলা না লেইখ্যা ধানের গোলাও লিখতে পারতেন।

এইসব উঁচুদরের কাব্যচর্চায় প্রায় ন'টা বাজল। তারপর আবার প্রচুর আহার এবং দোতলায় উঠে সোজা কম্বলের তলায় লম্বা হয়ে পড়া।

নতুন জায়গা, সহজে ঘুম আসছিল না! আমরা কান পেতে বাইরে ঝিঁঝির ডাক আর দূরে ঝরনার শব্দ শুনছিলুম। ক্যাবলা হঠাৎ বলে উঠল—ছাখ, আমার কিরকম সন্দেহ হচ্ছে। জোয়ানের আরকের সংগে থিয়োরি অফ রিলেটিভিটি—ইয়ার্কি নাকি! তারপর লোকটা নিজেকে বলছে বৈজ্ঞানিক—অথচ সারা বাড়িতে

একটাও সায়েন্সের বই দেখতে পেলুম না। খালি কতগুলো বিলিতি মাসিকপত্র আর ডিটেকটিভ বই। আমার মনে হচ্ছে—

বলতে বলতে ক্যাবলা চমকে থেমে গেল—ওটা কিসের আওয়াজ রে!

কির-কির-কির—পাশের বন্ধ ঘরটা থেকে একটা মেশিন চলবার মতো শব্দ উঠল। আর তারপরই—

অন্ধকার ঘরের শাদা দেওয়ালে মাঝারি সাইজের ছবির ফ্রেমের মতো চতুষ্কোণ আলো পড়ল একটা। আরে এ কী! আমরা চারজনেই তড়াক করে বিছানায় উঠে বসলুম—ছবি পড়ছে যে!

ছবি বই কি! সিনে ক্যামেরায় তোলা রঙিন ছবি! কিন্তু কী ছবি! এ কী—এ যে আমরাই! ম্যালে ঘুরছি—সিঞ্চলে সাতকড়ির সংগে কথা কইছি—টেনিদা ক্যাবলাকে চাঁটি মারতে যাচ্ছে—ঝাউ-বাংলোর নিচে আমাদের গাড়িটা এসে থামল।

তারপর—আঁকাবাঁকা অক্ষরে লেখা:

কাটা মুণ্ডুর নাচ দেখবে
শুনবে হাঁড়িচাঁচার ডাক—
কাগামাছির প্যাঁচ দেখে নাও—
একটু পরেই চিচিংফাঁক



সব শেষে ঃ

ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনার জন্য প্রস্তুত হও।

—ঝুমুবলাল

ফর্ কাগামাছি।

চৌকো আলোটা শাদা হয়ে দপ করে নিবে গেল। কির্ কির্ করে আওয়াজটাও আর শোনা গেল না।

অন্ধকারে ক্যাবলাই চেঁচিয়ে উঠল—পাশের ঘর, পাশের ঘর! ওখান থেকেই প্রোজেক্টার চালিয়েছে।

টেনিদা আলো জ্বালাল। ক্যাবলা ছুটে গিয়ে পাশের বন্ধ ঘরের দরজায় লাথি মারল একটা।

দরজা খুলল না। ভেতর থেকে বন্ধ।

হাবুল ছুটে গিয়ে আমাদের ঘরের দরজা খুলতে গেল। সেটাও খুলল না। বাইরে থেকে কেউ শেকল বা তালা আটকে দিয়েছে বলে মনে হল।

॥ ৭ ॥

কাটামুণ্ডুর নাচ

যতই টানাটানি করি আর চেঁচিয়ে গলা ফাটাই, দরজা আর কিছুতে খোলে না। শেষ পর্যন্ত হাবুল সেন ধপ করে মেজের ওপর বসে পড়ল।

—এই কাগামাছি অখন আমাগো মাছির মতন টপাটপ কইরা ধইরা খাইবো।

—চার-চারটে লোককে গিলে খাবে—ইয়ার্কি নাকি? ক্যাবলা কখনো ঘাবড়ায় না, সে বললে—পুব দিকের জানলার কাছে বড়ো একটা গাছ রয়েছে টেনিদা। একটু চেষ্টা করলে সেই গাছ বেয়ে আমরা নেমে যেতে পারি।

আমি বললুম—আর নামবার সংগে সংগে কাগামাছি আমাদের এক একজনকে—

—রেখে দে তোর কাগামাছি! সামনে আসুক না একবার, তারপর দেখা যাবে। টেনিদা, তুমি আমাদের লিডার, তুমিই এগোও।

কনকনে শীত, বাইরে অন্ধকার, তার ওপর এই সব ঘোরতর রহস্যময় ব্যাপার। জানলা দিয়ে গাছের ওপর লাফিয়ে পড়া-টড়া সিনেমায় মন্দ লাগে না, কিন্তু টেনিদার খুব উৎসাহ হচ্ছে বলে মনে হল না। মুখটাকে বেগুনভাজার মতো করে বললে—তারপর হাত-পা ভেঙে মরি আর কি? ও সব ইন্দ্রলুপ্ত—মানে ধাষ্টামোর মধ্যে আমি নেই।

ক্যাবলা বললে—ইন্দ্রলুপ্ত মানে টাক। ধাষ্টামো নয়।

টেনিদা আরো চটে বললে—শাট আপ্। আমি বলছি, ইন্দ্রলুপ্ত মানে ধাষ্টামো। আমাকে বকাস নি ক্যাবলা, আমি এখন খুব সিরিয়াসলি সবটা বোঝবার চেষ্টা করছি।

ক্যাবলা বিরক্ত হয়ে বললে—তাহলে তুমি বোঝবার চেষ্টাই করো। আর আমি ততক্ষণে গাছ বেয়ে নামতে চেষ্টা করি।

টেনিদা বললে—এটাতো এক নম্বরের পুঁইচচ্চড়ি—মানে পুঁদিচ্চেরি বলে মনে হচ্ছে। এই প্যালা—শক্ত করে ওর ঠ্যাং দুটো টেনে ধর দিকি। এখুনি গাছ থেকে পড়ে একটা কেলেঙ্কারি করবে।

পত্র পাঠ আমি ক্যাবলাকে চেপে ধরতে গেলুম আর ক্যাবলা তক্ষুনি পটাং করে আমাকে একটা ল্যাং মারল। আমি সংগে সংগে হাবুলের ঘাড়ের ওপর গিয়ে পড়লুম আর হাবুল হাউমাউ করে চেঁচিয়ে উঠল—খাইছে—খাইছে।

টেনিদা চিৎকার করে বললে—অল কোয়ায়েট! এখন সমূহ বিপদ! নিজেদের মধ্যে মারামারির সময় নয়। বালকগণ, তোমরা সব স্থির হয়ে বসো, আর আমি যা বলছি কান পেতে শোনো। দরজা বন্ধ হয়ে আছে থাকুক—ওতে আপাতত আমাদের কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি হচ্ছে না। আমরা আপাতত কম্বল গায়ে চড়িয়ে শুয়ে থাকি। সকাল হোক—তারপরে—

টেনিদা আরো কী বলতে যাচ্ছিল, ঠিক তখনি বাইরে থেকে বিকট আওয়াজ উঠল—চ্যাঁ চ্যাঁ চ্যাঁ—

হাবুল বললে—প্যাঁচা!

আওয়াজটা এবার আরো জোরালো হয়ে উঠল: চ্যাঁ—চ্যাঁ—ঘ্যাঁচ—ঘ্যাঁচা—ঘ্যাঁচা—

ক্যাবলা বললে—প্যাঁচা তো অত জোরে ডাকে না, তাছাড়া ঘ্যাঁচা ঘ্যাঁচা করছে যে!

আমি পটলডাঙার প্যালারাম, অনেক দিন পালাজ্বরে ভুগেছি আর বাসকপাতার রস খেয়েছি। পেটে একটা পালাজ্বরের পিলে ছিল, সেটা পটোল দিয়ে শিঙি মাছের ঝোল খেতে খেতে কোথায় সটকে পড়েছিল। কিন্তু ওই বিকট আওয়াজ শুনে কোত্থেকে তড়াক করে লাফিয়ে উঠল আবার আর গুরগুর করে কাঁপুনি ধরে গেল তার ভেতরে।

তখুনি আমি বিছানায় উঠে পড়ে একটা কম্বল মুড়ি দিলুম। বললুম—আমি গোবরডাঙায় পিসিমার বাড়ি ও-আওয়াজ শুনেছি। ওটা হাঁড়িচাঁচা পাখির ডাক।

বাইরে থেকে সমানে চলতে লাগল সেই ঘ্যাঁচা—ঘ্যাঁচা শব্দ আর হাবুল ঝুমুরলালের সেই প্রায় কবিতাটা আওড়াতে লাগল ঃ

'তান ধরেছে হাঁড়িচাঁচায়,
কুণ্ডুমশাই মুণ্ডু নাচায়!'

সবাই চুপ, আরো মিনিট খানেক ঘ্যাঁচর ঘ্যাঁচর করে হাঁড়িচাঁচা থামল। ততক্ষণে আমাদের কান ঝাঁ ঝাঁ করছে, মাথা বনবন করছে, আর বুদ্ধিশুদ্ধি সব হালুয়ার মতো তালগোল পাকিয়ে গেছে একেবারে। বেপরোয়া ক্যাবলা পর্যন্ত স্পিকটি নট। জানলা দিয়ে নামবার কথাও আর বলছে না।

হাবুল অনেকক্ষণ ভেবেচিন্তে বললে—খুবই ফ্যাসাদে পইড়া গেলাম দেখতাছি! অখন কী করন যায়?

আমি আরো ভালো করে কম্বল মুড়ি দিয়ে বললুম—বাপ রে! কী বিচ্ছিরি আওয়াজ! আর একবার হাঁড়িচাঁচার ডাক উঠলে আমি সত্যিই হার্টফেল করব, টেনিদা।

টেনিদা হাত বাড়িয়ে টকাস্ করে আমার মাথার ওপরে একটা গাঁট্টা মারল।

—খুব যে ফুর্তি দেখছি, হার্টফেল করবেন! অংকে ফেল করে করে তোর অভ্যেসই খারাপ হয়ে গেছে। আমরা মরছি নিজের

জ্বালায় আর ইনি দিচ্ছেন ইয়ার্কি। চুপচাপ বসে থাক প্যালা! হার্ট-ফার্ট ফেল করাতে চেষ্টা করবি তো এক চাঁটিতে তোর কান—

এত দুঃখের মধ্যেও হাবুল বললে—কানপুরে উইড়া যাইবো।

ক্যাবলা গম্ভীর হয়ে বসেছিল। ডাকল—টেনিদা?

—বলে ফেল।

—রাত্তিরে হাঁড়িচাঁচা ডাকে নাকি?

আমি বললুম—কাগামাছি—স্পেশাল হাঁড়িচাঁচা। যখন খুশি ডাকতে পারে।

—দুত্তোর। —ক্যাবলা বিষম ব্যাজার হয়ে বললে—আমার একটা সন্দেহ হচ্ছে, টেনিদা।

—কি সন্দেহ শুনি?

—কাগামাছি-টাছি সব বোগাস। ওই সবুজদাড়ি সাতকড়ি লোকটাই সুবিধের নয়। রাত্তিরে ইচ্ছে করে আমাদের ভয় দেখাচ্ছে। প্রকৃতিকে ভালোবাসলেই সবুজ রঙের দাড়ি রাখতে হবে! এমন একটা যা-তা ফরমুলা বলছে—যার কোনো মানেই হয় না। থিয়োরি অফ রিলেটিভিটির সংগে জোয়ানের আরক? পাগল না পেট-খারাপ ভেবেছে আমাদের!

টেনিদা বললে—কিন্তু সেই মিচকে পটাশ লোকটা?

—আর সিনে ক্যামেরা দিয়া আমাগো ছবিই বা তুলল কেডা? হাবুলের জিজ্ঞাসা।

—আর ছুঁচোবাজিই বা ছুড়ল কে?—আমি জানতে চাইলুম।

ক্যাবলা বললে—হুঁ। তবে সাতকড়ির পকেটে আমি দেশলাইয়ের খড়খড়ানি ঠিকই শুনতে পেয়েছিলুম। আমার মনে হয় সাতকড়িই কুয়াশার ভেতর থেকে ওটা ছুড়ে দিয়ে—

বলতে বলতেই আবার ঃ—

—ট্যাঁ-ট্যাঁ-ঘ্যাঁচ-ঘ্যাঁচা-ঘ্যাঁচা—

হাবুল বললে—উঃ—সারছে!

আমি প্রাণপণে কান চেপে ধরলুম।

ক্যাবলা তড়াক করে উঠে দাঁড়াল। বললে—বুঝেছি—জানলার নিচ থেকেই শব্দটা আসছে। আচ্ছা, দাঁড়াও!

বলেই আর দেরি করল না। টেবিলের ওপর কাচের জগভর্তি জল ছিল, সেইটে তুলে নিয়ে জানলা দিয়ে গব-গব করে ঢেলে দিলে। ঘ্যাঁচা-ঘ্যাঁচা-ঘ্যাঁক্ করে আওয়াজটা থেমে গেল মাঝপথেই। তারপরেই মনে হল, বাইরে কে যেন হুড়মুড় করে ছুটে পালাল। আরো মনে হল, কে যেন অনেক দূরে ফ্যাঁচ্‌চো ফ্যাঁচ্‌চো করে হেঁচে চলেছে।

ক্যাবলা হেসে উঠল।

—দেখলে টেনিদা, হাঁড়িচাঁচা নয়—মানুষ। একজগ ঠাণ্ডা জলে ভালো করে নাইয়ে দিয়েছি, সারা রাত ধরে হেঁচে মরবে এখন। রাত্তিরে আর বিরক্ত করতে আসবে না।

হাবুল বললে—কাগামাছি হাঁচতে আছে। আহা—ব্যাচারার শ্যাষকালে নিমোনিয়া না হয়।

টেনিদা বললে—হোক নিউমোনিয়া, মরুক। ফিলিম দেখাচ্ছে. সমানে ঘ্যাঁচা ঘ্যাঁচা করছে—একটু ঘুমুতে দেবার নামটি নেই! চুলোয় যাক ওসব। দরজা যখন খুলবেই না—তখন আর কী করা যায়। তার চাইতে সবাই শুয়ে পড়া যাক। কাল সকালে যা হোক দেখা যাবে!

ক্যাবলা বললে—হুঁ, তা হলে শুয়েই পড়া যাক। আবার যদি হাঁড়িচাঁচা বিরক্ত করতে আসে, তা হলে ওপর থেকে এবার চেয়ার ছুড়ে মারব।

কম্বল জড়িয়ে আমরা বিছানায় লম্বা হলুম, মিনিট পাঁচেকের ভেতরেই টেনিদার নাক কুরকুর করে ডাকতে লাগল, হাবুল আর ক্যাবলাও ঘুমিয়ে পড়ল বলে মনে হল। কিন্তু আমার ঘুম আসছিল

না। বাইরে রাত ঝম ঝম করছে, ঝিঁ ঝিঁ ডাকছে—জানলার কাচের ভেতর থেকে কালো কালো গাছের মাথা আর আকাশের জ্বলজ্বলে একরাশ তারা দেখা যাচ্ছে। সে দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে মনে হচ্ছিল, বেশ ছিলুম দার্জিলিঙে, খামোকা কাগামাছির পেছনে এই পাহাড়-জংগলে এসে পড়েছি। কাছাকাছি জন-মানুষ নেই, এখন যদি কাগামাছি ঘরে ঢুকে আমাদের এক-একজনকে মাছির মতোই টপাটপ গিলে ফেলে, তাহলে আমরা ট্যা ফোঁ করবারও সুযোগ পাব না। তার ওপর এই শীতে এক জগ ঠাণ্ডা জল গায়ে ঢেলে দেওয়ায় কাগামাছি নিশ্চয় ভয়ংকর চটে রয়েছে। যদিও হাবুল আমার পাশেই শুয়েছে। তবু সাহস পাবার জন্যে ওকে আমি আস্তে আস্তে ধাক্কা দিলুম।

—এই হাবলা, ঘুমুচ্ছিস নাকি ?

আর হাবুল তক্ষুনি হাউমাউ করে এক রাম চিৎকার ছেড়ে লাফিয়ে উঠল।

নাকের ডাক বন্ধ করে টেনিদা হাঁক ছাড়ল—কী-কী হয়েছে ?

ক্যাবলা কম্বলসুদ্ধু নেমে পড়তে গিয়ে কম্বলে জড়িয়ে ধড়াম করে আছাড় খেল একটা।

টেনিদা বললে—কী হয়েছে রে হাবুল, চেঁচালি কেন ?

—কাগামাছি আমারে গুঁতা মারছে।

—কাগামাছি নয় আমি। —আমি এই কথাটা কেবল বলতে যাচ্ছি, ঠিক তখন—

তখন সেই ভয়ংকর ঘটনাটা ঘটল।

বড়ো আলো দুটো নিবিয়ে একটা নীল বাতি জ্বেলে আমরা শুয়ে পড়েছিলুম। হালকা আলোয় ছায়া-ছায়া ঘরটার ভেতর দেখা গেল এক রোমহর্ষক দৃশ্য !

আমারই চোখে পড়েছিল প্রথম। আমি চেঁচিয়ে উঠলুম ; —ও কী ?



ঘবের ঠিক মাখঝানে—শূন্যে কী ঝুলছে ওটা ?

আবছা আলোতেও স্পষ্ট দেখা গেল—ঠিক যেন হাওয়ায় একটা প্রকাণ্ড কাটামুণ্ডু নাচছে। তাব বড়ো বড়ো দাঁত, দুটো মিট-মিটে চোখ—ঠিক যেন আমাদেব দিকে তাকিয়ে মিটমিট করে হাসছে সে।

আমরা চারজনেই এক সংগে বিকট চিৎকার ছাড়লুম। তৎক্ষণাৎ ঘবের নীল আলোটাও নিবে গেল, কে যেন বিশ্রী গলায় হেসে উঠল, আর আমি—

আমার দাঁতকপাটি লাগল নির্ঘাত। আর অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার আগেই টের পেলুম, খাটেব ওপর থেকে একটা চাল-কুমড়োর মতো আমি ধপাত্ করে মেজেতে গড়িয়ে পড়েছি।

॥ ৮ ॥

রাতের তদন্ত

খুব সম্ভব দাঁতকপাটি লেগে গিয়েছিল। আর রাত দুপুরে মাথার ওপর বেমক্কা একটা কাটা মুণ্ডু এসে যদি নাচতে শুরু করে দেয়, তাহলে কারই বা দাঁতকপাটি না লাগে? কিন্তু বেশিক্ষণ অজ্ঞান হয়েও থাকা গেল না, কে যেন পা ধরে এমন এক হ্যাঁচকা টান মারল যে কম্বল-টম্বল সুদ্ধু আমি আর এক পাক গড়িয়ে গেলুম।

তখনো চোখ বন্ধ করেই ছিলুম। হাউমাউ করে চেঁচিয়ে বললুম—কাগামাছি—কাগামাছি!

—দুত্তোর কাগামাছি! ওঠ বলছি—কোত্থেকে যেন ক্যাবলাটা চেঁচিয়ে উঠল।

উঠে বসে দেখি, কাটা মুণ্ডু-টুণ্ডু কিচ্ছু নেই—ঘরে আলো জ্বলছে। টেনিদা হাঁ করে ওপর দিকে তাকিয়ে আছে। হাবুল সেন গুটি গুটি বেরিয়ে আসছে একটা খাটের তলা থেকে।

টেনিদা বললে—ভূতের কাণ্ড রে ক্যাবলা! কাগামাছি স্রেফ ভূত ছাড়া কিছু নয়।

হাবুল কাঁপতে কাঁপতে বললে—মূলার মতো দাঁত বাইর কইর‍্যা খ্যাঁচ খ্যাঁচ কইর‍্যা হাসতে আছিল। ঘাঁক কইর‍্যা একখান কামড় দিলেই তো কম্ম সারছিল!

ক্যাবলা বললে—হুঁ!

আমি বললুম—হুঁ কী? রাত ভোর হোক, তারপরেই আমি আর এখানে নেই। সোজা দার্জিলিং পালিয়ে যাব।

ক্যাবলা বললে—পালা, যে চুলোয় খুশি যা। কিন্তু যাওয়ার আগে একবার ওই স্কাই-লাইটটা লক্ষ করে দেখ।

—আবার মুণ্ডু আসছে নাকি?—বলেই হাবুল তক্ষুনি খাটের তলায় ঢুকে পড়ল। টেনিদা একটা লাফ মারল আর আমি পত্রপাঠ বিছানায় উঠে কম্বলের তলায় ঢুকে গেলুম।

ক্যাবলা ভীষণ বিরক্ত হয়ে বললে—আরে তুম্‌লোগ বহুত ডরপোক হো! ছাখ না তাকিয়ে ও দিকে। স্কাই-লাইটটা খোলা। ওখান দিয়ে দড়ি বেঁধে একটা মুণ্ডু যদি ঝুলিয়ে দেওয়া যায় আর তারপরেই যদি কেউ স্যুড়ুত্‌ করে সেটাকে টেনে নেয়—তাহলে কেমন হয়?

টেনিদা জিগগেস করলে—তা হলে তুই বলছিস ওটা—

—হ্যাঁ যদ্দুর মনে হচ্ছে, একটা কাগজের মুখোস।

হাবুল আবার গুটি গুটি বেরিয়ে এল খাটের নিচের থেকে। আপত্তি করে বললে,—না-না, মুখোস না। মুখে মুলোর মতন দাঁত আছিল।

—তুই চুপ কর।—ক্যাবলা চেঁচিয়ে উঠল—কাওয়ার্ড কোথাকার। শোন, আমি বলছি। যাওয়ার আগে যদি এই মুলোর মতো দাঁতগুলোকে গুঁড়ো করে দিয়ে যেতে না পারি, তাহলে আমার নাম কুশল মিত্তিরই নয়!

—তার আগে ওইটাই আমাগো কচমচাইয়া চাবাইয়া খাইবো।

ক্যাবলা গজগজ করে কী বলতে যাচ্ছিল, ঠিক সেই সময় দরজা দিয়ে সাতকড়ি সাঁতরা এসে ঢুকলেন।

—ব্যাপার কী হে তোমাদের? রাত সাড়ে বারোটা বাজে—এখনো তোমরা ঘুমোও নি নাকি? আমি হঠাৎ জেগে উঠে দেখি তোমাদের ঘরে আলো জ্বলছে। তাই খবর নিতে এলুম।

টেনিদা চটে বললে—আচ্ছা লোক মশাই আপনি! এতক্ষণে খবর নিতে এলেন! ওদিকে আমরা মারা যাওয়ার জো! বাইরে

থেকে দরজা বন্ধ, ভেতরে ভূতের কাণ্ড চলছে, আর আপনি বলছেন ঘুমুই নি কেন!

সাতকড়ি অবাক হয়ে বললেন—কেন, দরজা তো খোলাই ছিল!

—খোলা ছিল! আধঘণ্টা টানাটানি করে আমরা খুলতে পারি নি।

সাতকড়ি ঘাবড়ে গেলেন। একটা চেয়ারে বসে পড়ে বললেন, —কী হয়েছিল বলো দেখি?

আমি বললুম—বিনামূল্যে ফিলিম শো দেখেছি।

টেনিদা বললে—ঘ্যাঁচা ঘ্যাঁচা করে কানের কাছে বিচ্ছিরি-ভাবে হাঁড়িচাঁচা ডাকছিল। এককুঁজো জল তার মাথায় ঢেলে ক্যাবলা তাকে তাড়িয়েছে।

হাবুল বললে—আর চালের থনে অ্যাকটা কাটা মুণ্ডু বত্রিশটা দাঁত বাইর কইরা তুরুক তুরুক লাফাইতে আছিল।

টেনিদা কশে একটা গাঁট্টা বাগাল। দাঁতে দাঁত ঘসে বললে, —ব্যাটা নির্ঘাত মেফিস্টোফিলিস। একবার সামনে পেলে এমন দুটো ডি-লা-গ্র্যাণ্ডি মেরে দেব যে ইয়াক ইয়াক হয়ে যাবে।

সাতকড়ি বললেন—দাঁড়াও-দাঁড়াও, ব্যাপারটা বুঝে দেখি। তার আগে তোমাদের একটু ভুল শুধরে দিই। মেফিস্টোফিলিস হল শয়তান। পুরুষ—ফরাসি ভাষায় মাসক্যুলাঁ্যা। আর মাসক্যুলাঁ্যা হলে বলা উচিত ল্য গ্রাঁ। অর্থাৎ কিনা মস্ত বড়। আর 'ডি'—অর্থাৎ 'দ্য' টা ওখানে—

টেনিদা বললে—থামুন-থামুন। আমরা মরছি নিজের জ্বালায়, আর আপনি এই মাঝরাত্তিরে ফরাসি শোনাতে এসেছেন। আচ্ছা লোক তো!

—আচ্ছা, থাক-থাক। এখন খুলে বলো!

আমি বললুম—আপনি হাঁড়িচাঁচার ডাক শোনেন নি?

—হাঁড়িচাঁচার ডাক? না তো!—সাতকড়ি যেন গাছ থেকে পড়লেন।

হাবুল বললে—কন্ কী মশায়? আপনে কুম্ভকর্ণ নাকি! আমাগো কান ফাইটা যাইতাছিল আর আপনে শুনতেই পান নাই?

ক্যাবলা বললে—আঃ। তোরা একটু থাম তো বাপু। এমন-ভাবে সবাই মিলে বক-বক করলে কোনো কাজ হয়? আমি বলছি শুনুন।

টেনিদা বললে—রাইট। অর্ডার—অর্ডার।

ক্যাবলা সব বিশদ বিবরণ শুনিয়ে দিলে সাতকড়িবাবুকে। সাতকড়ি কখনো হাঁ করলেন, কখনো চোখ গোল গোল করলেন, কখনো বললেন, মাই গড—! শেষপর্যন্ত সমস্ত শুনে একটা হুতোম প্যাঁচার মতো থ হয়ে রইলেন।

টেনিদা বললে—তাহলে—

—তাহলে সেই কাগামাছি। এবার ঘোর বেগে আমাকে আক্রমণ করেছে দেখছি! নাঃ ফরমুলাটা আর বাঁচানো যাবে না মনে হচ্ছে! আমার এতদিনের সাধনা—এমন যুগান্তকারী আবিষ্কার—সব গেল—

আমি বললুম—এত ঝামেলার মধ্যে না গিয়ে যদি পুলিশে খবর দেন—

—পুলিশ!—সাতকড়ি সাঁতরা কিছুক্ষণ এমন বিচ্ছিরি মুখ করে আমার দিকে চেয়ে রইলেন যে মনে হল এর চাইতে অদ্ভুত জীবনে কোনোদিন তিনি শোনেন নি।

ক্যাবলা বলবে—আচ্ছা সাঁতরা মশাই, আমাদের পাশের ঘরে কী আছে?

সাতকড়ি বললে—ওটা? ওটা স্ট্যাকরুম। মানে বাড়ির বাড়তি আর ভাঙাচুরো জিনিশপত্র জড়ো করে রাখা হয়েছে ওতে।

—ওর দরজার চৌকো ফুটোটা এল কী করে? মানে, যা দিয়ে এ ঘরের দেওয়ালে প্রজেক্টার দিয়ে ছবি ফেলা যায়?

—চৌকো ফুটো?—সাতকড়ি আকাশ থেকে পড়লেন—ফুটো আবার কে করবে? ফুটোফাটার কথা আবার কেন? কোনো ফুটোর খবর তো আমি জানিনে।

—তা হলে জেনে নিন। ওই দেখুন।

সাতকড়ি উঠে দেখলেন আর দেখেই মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন।

—সর্বনাশ! কাগামাছি দেখছি আমার ঘরে আড্ডা গেড়েছে। এবার আমি গেলুম!—সবুজ দাড়ি মুঠোয় চেপে ধরে তিনি হায় হায় করতে লাগলেন—একেবারে মারা গেলুম দেখছি।

ক্যাবলা বললে—মারা একটু পরে যাবেন। তার আগে ওই ঘরটা খুলবেন চলুন।

—ঘর? মানে ও ঘরটা? ও খোলা যায় না।

—কেন খোলা যায় না?

সাতকড়ি বুঝিয়ে বললেন—মানে আসবার সময় ও ঘরের চাবি কলকাতায় ফেলে এসেছি কি না। আর দুটো পেল্লায় তালা ও ঘরে লাগানো আছে।

—সে তালা ভাঙতে হবে।

সাতকড়ি হেসে বললেন—তা হলে দার্জিলিং থেকে কামার আনতে হয়। এমনিতে ও ভাঙবার বস্তু নয়।

টেনিদা বললে—চলুন, দেখা যাক।

সবাই বেরুলুম। সারা বাড়িতে আলো জ্বলছে তখন। সাতকড়িই জ্বেলে দিয়েছেন নিশ্চয়। পাশের ঘরের সামনে গিয়ে দেখা গেল, ঠিকই বলেছেন ভদ্রলোক। আধ হাত করে লম্বা দুটো তালা ঝুলছে। কামারেও শানাবে বলে মনে হল না—খুব সম্ভব

কামান দাগতে হবে।

টেনিদা বললে—কাল সকালে দেখতে হবে ভালো করে।

ক্যাবলা বললে—এবার চলুন, বাইরে বেরুনো যাক।

আমি ঘাবড়ে গিয়ে বললুম—আবার বাইরে কেন? কোথায় কাগামাছির লোক ঘাপটি মেরে বসে আছে! তার ওপর এই হাড়-কাঁপানো শীত—বরং কালকে—

ক্যাবলা আমার দিকে কটমট করে তাকিয়ে বললে—তবে তুই একলা ঘরে শুয়ে থাক! আমরা দেখে আসি।

সর্বনাশ, বলে কী। একলা ঘরে থাকব! আর কায়দা পেয়ে ওপর থেকে কাটা মুণ্ডুটা ঝাঁ করে আমাকে তেড়ে আসুক! কামড়াবারও দরকার হবে না—আর একবার দন্ত-বিকাশ করলেই আমি গেছি।

চাঁদিটা চুলকে নিয়ে বললুম—না-না-চলো, আমি তোমাদের সঙ্গেই যাচ্ছি। মানে, তোমাদেরও তো একটু সাহস দেওয়া দরকার!

বাইরে ঠাণ্ডা কালো রাত। পাইনের বন কাঁপিয়ে হু হু করে বাতাস দিচ্ছে—কুয়াশা ছিঁড়ে ছিঁড়ে যাচ্ছে হাওয়ায়। দূরের কালো কালো পাহাড়ের মাথায় মোটা ভুটিয়া কম্বলের মতো পুরু পুরু মেঘ জমেছে, লাল বিদ্যুৎ ঝলসাচ্ছে তার ভেতরে। সব মিলে যেন বুকের মধ্যে কাঁপুনি ধরে গেল আমার। এমন রাতে কোথায় ভরপেট খেয়ে লেপ কম্বলের তলায় আরামসে ঘুম লাগাব, তার বদলে হতচ্ছাড়া কাগামাছির পাল্লায় পড়ে—উঃফ্!

সাতকড়ি সঙ্গে টর্চ এনেছিলেন। সেই আলোয় আমরা দেখলুম, ঠিক আমাদের জানালার নিচে মাটিতে খানিকটা জল রয়েছে তখনো, আর তার ভেতরে কার জুতোপরা পায়ের দাগ।

ক্যাবলা বললে—হাঁড়িচাঁচা। মাথায় জল পড়তে কেটে পড়েছে।

পাশেই ঘাস। কাজেই জুতোপরা হাঁড়িচাঁচা কোনদিকে যে পালিয়েছে বোঝা গেল না। আরো খানিকক্ষণ এদিক ওদিক ঘোরাফেরা করে আমরা আবার ফিরে এলুম।

সাতকড়ি বললেন,—যা হওয়ার হয়েছে—এবার তোমরা শুয়ে পড়ো। আজ আর কোনো উৎপাত হয়তো হবে না। যাই হোক—আমি রাত জেগে পাহারা দেব এখন।

টেনিদা বললে—আমরাও পাহারা দেব।

—না-না, সেকি হয়! হাজার হোক তোমরা আমার অতিথি। শুয়ে পড়ো, শুয়ে পড়ো। দরকার হলে তোমাদের আমি ডাকব এখন।

আমরা যখন শুতে গেলুম, তখন ঝাউ-বাংলোর হল ঘরের ঘড়িটায় টং করে একটা বাজল।

শোবার আগে দুটো কাজ করল ক্যাবলা। প্রথমে দড়ি টেনে টেনে সব কটা স্কাইলাইট ভালো করে বন্ধ করল, তারপর ড্রেসিং টেবিলটা টেনে এনে পাশের ঘরের দরজার সামনে দাঁড় করালে—যাতে ওখান থেকে কাগামাছি আবার আমাদের দেওয়ালে প্রজেকটারের আলো ফেলতে না পারে।

তারপর কাগামাছির কথা ভাবতে ভাবতে আমাদের ঘুম এল, আর সেই ঘুম একটানা চলল সকাল পর্যন্ত। কিন্তু তখন আমরা স্বপ্নেও কল্পনা করিনি—পরের দিন কী নিদারুণ বিভীষিকা আমাদের জন্যে অপেক্ষা করে আছে!

॥ ৯ ॥

সাতকড়ি গায়েব

ঘুমুব কি ছাই! সকলকে তড়াক করে লাফিয়ে উঠতে হল কাঞ্ছার হাউমাউ চিৎকারে।

—কী হল কাঞ্ছা—ব্যাপার কী?

কাঞ্ছা বললে—বাবু গায়েব।

—গায়েব?

কাঞ্ছা জবাব দিলে—জু।

—কোথায় গায়েব? কেমন করে গায়েব?

কাঞ্ছা হাউহাউ করে অনেক কথাই বলে গেল নেপালি ভাষায়। তোমরা তো আর সবাই নেপালি বুঝবে না, সন্দেশের সম্পাদক-মশাইরাও সে কান্না-জড়ানো ভাষা কতটা বুঝবেন তাতে আমার সন্দেহ আছে। তাই সকলের সুবিধের জন্যে কাঞ্ছার কথাগুলো মোটামুটি সাদা বাংলায় লিখে দিচ্ছি।

কাঞ্ছার বক্তব্য হচ্ছে—

রোজ ভোরে পাঁচটায় নাকি সাতকড়ি সাঁতরা এককাপ চা খেতেন। কাঞ্ছা বললে—'ব্যাড টি' আর সৌখিন লোক সবুজদাড়ি সাঁতরা মশাই খারাপ চা খেতেন ভাবতেই আমার বিচ্ছিরি লাগল। ক্যাবলা আমার কানে কানে বললে,—'বোধহয় বেড-টি মিন করেছে।' যাই হোক, ভোরবেলা কাঞ্ছা চা নিয়ে ঘরে ঢুকতেই একেবারে থ! বাংলা ডিটেকটিভ বইতে যেমন লেখা থাকে—হুবহু ঠিক তাই ঘটেছে। অর্থাৎ ঘরটি একেবারে তচনচ—বালিশ কম্বল সব মেজেয় পড়ে আছে, এক কোণে একটা টিপয় কাত হয়ে রয়েছে,

কার একটা ভাঙা হুঁকো রয়েছে সাতকড়ির বিছানার ওপর, দরজার বাইরে একগাছা মুড়ো ঝাঁটা, সিঁড়িতে দেখা যাচ্ছে কুকুরে চিবুনো একপাটি চপ্পল। মানে অনেক কিছুই আছে—কেবল নেই সাতকড়ি সাঁতরা। তিনি স্রেফ হাওয়া হয়ে গেছেন।

টেনিদা বললে—বোধহয় বেড়াতে বেরিয়েছেন।

কাঙ্গা জানালে, সেটা অসম্ভব, কারণ ভোর পাঁচটায় ব্যাড টি না পেলে পাঁচটা বেজে সাত মিনিটের সময় সাতকড়ি চিৎকার করে কাঙ্গাকে ডাকেন আর গ্যাড ম্যাড করে ইংরেজিতে গাল দিতে থাকেন। সুতরাং চা না খেয়ে ঘর থেকে বেরুবেন এমন বান্দাই তিনি নন। তা ছাড়া নিজের বালিশ-বিছানা নিয়ে এর আগে তাঁকে কোনদিন কুস্তি লড়তেও দেখা যায়নি। আরো বড় কথা, ভাঙা হুঁকো, মুড়ো ঝাঁটা আর কুকুরে চিবুনো চপ্পলই বা এল কোত্থেকে? তবু দেড় ঘণ্টা দু-ঘণ্টা ধরে কাঙ্গা সব জায়গায় তাঁকে খুঁজেছে। কিন্তু কোথাও তাঁর সবুজ দাড়ির ডগাটি পর্যন্ত খুঁজে না পেয়ে শেষ পর্যন্ত এসে ডেকে তুলেছে আমাদের।

কিছুক্ষণ আমরা বোকার মতো দাঁড়িয়ে রইলুম। শেষে টেনিদা বললে—তাহলে একবার দেখে আসা যাক ঘরটা।

হাবুল সেন বললে—দেইখ্যা আর হইবো কী! কাগামাছিতে তারে লইয়া গেছে।

ক্যাবলা বললে—তুই একটু চুপ কর তো ক্যাবলা। দেখাই যাক না একবার।

আমরা সাতকড়ি সাঁতরার ঘরে গেলুম। ঠিকই বলেছে কাঙ্গা। ঘরের ভেতরে একেবারে হৈ হৈ কাণ্ড—রৈ রৈ ব্যাপার! সবকিছু ছড়িয়ে-টড়িয়ে একাকার। ভাঙা হুঁকো, ছেঁড়া চপ্পল, মুড়োঝাঁটা—সব রেডি।

টেনিদা ভেবে-চিন্তে বললে—ওই ছেঁড়া চপ্পল পায়ে দিয়ে হুঁকো খেতে খেতে কাগামাছি এসেছিল।

হাবুল মাথা নেড়ে বললে—হুঁ। আর ওই ঝাঁটাটা দিয়া সাঁতরা মশয়রে রামপিটানি দিয়েছে।

তখন আমার মগজে দারুণ একটা বুদ্ধি তড়াং করে নেচে উঠল। আমি বললুম—ভাঙা হুঁকোতে তামাক খাবে কী করে? ওর একটা গভীর অর্থ আছে। জাপানিরা হুঁকো কবিতা লেখে কিনা তাই কাগামাছি হুঁকোটা রেখে জানিয়ে গেছে যে সে জাপানি।

শুনে, ক্যাবলা ঠিক ডিমভাজার মতো বিচ্ছিরি মুখ করে আমাকে ভেংচে উঠল—থাম থাম, তোকে আর ওস্তাদি করতে হবে না। হুক্কো কবিতা হুঁকো হবে কোন দুঃখে? আর কার এমন দায় পড়েছে যে সাত বছরের পুরোনো কুকুরে খাওয়া চটি পায়ে দেবে? পায়ে কি দেওয়াই যায় ওটা? তা ছাড়া কে কবে শুনেছে যে ডাকাত মুড়ো ঝাঁটা নিয়ে আসে? সে তো পিস্তল-টিস্তল নিয়ে আসবে।

—হয়তো কাগামাছির পিস্তল-টিস্তল নেই, সে গরিব মানুষ। আব ওটা যে সাধারণ একটা মুড়ো খ্যাংরা তাই বা কে বললে? হয়তো ওর প্রত্যেকটা কাঠিতে সংঘাতিক বিষ রয়েছে, হয় তো ওর মধ্যে ডিনামাইট ফিট করা আছে—

ক্যাবলার ডিমভাজার মতো মুখটা এবার আলু-কাবলির মতো হয়ে গেল—হয়তো ওর মধ্যে একটা অ্যাটম্ বম্ আছে, দুটো স্পুটনিক আছে, বারোটা নেংটি ইঁদুর আছে! যতসব রদ্দিমার্কা ডিটেকটিভ বই পড়ে তোদের মাথাই খারাপ হয়ে গেছে দেখছি! —বলে, আমরা হাঁই হাঁই করে ওঠবার আগেই সে মুড়ো ঝাঁটাটায় জোরে লাথি মারল একটা। বোমা ফাটল না, দাড়ুম-দুড়ুম কোনো আওয়াজ হল না, ক্যাবলা মারা পড়ল না, কেবল ঝাঁটাটা সিঁড়ি দিয়ে গড়াতে গড়াতে সোজা বাগানে গিয়ে নামল।

ঠিক তখন ক্যাবলা চেঁচিয়ে উঠল—আরে এইটা কী?

হুঁকোর মাথায় যেখানটায় কলকে থাকে, সেখানে একটা

কাগজের মতো কী যেন পাকিয়ে গোল করে ঢুকিয়ে রাখা হয়েছে। হাবুল হুঁকোটা তুলে আনতেই টেনিদা ছোঁ মেরে কাগজটা তুলে নিলে।

ডিটেকটিভ বইতে যেমন লেখা থাকে, অবিকল সেই ব্যাপার।

একখানা চিঠিই বটে। আমরা একসংগে ঝুঁকে পড়ে দেখলুম, চিঠিতে লেখা আছে :

'প্রিয় চার বন্ধু!

কাগামাছি দলবল নিয়ে ঘেরাও করেছে—দু-মিনিটের মধ্যেই এসে পড়বে। আমি জানি, এক্ষুনি তারা লোপাট করবে আমাকে। তাই ঝটপট লিখে ফেলছি চিঠিটা। আমাকে গায়েব করে ফরমুলাটা জেনে নেবে। তোমরা আমাকে খুঁজতে চেষ্টা কোরো। কিন্তু সাবধান—পুলিশে খবর দিয়ো না। তাহলে তক্ষুনি আমায় খুন—'

আর লেখা নেই। কিন্তু চিঠিটা যে সাতকড়িরই লেখা তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বেশ বোঝা যাচ্ছে, এটুকু লেখবার পরেই সদলবলে কাগামাছি এসে ওঁকে খপ করে ধরে ফেলেছে।

রহস্য নিদারুণ গভীর! এবং ব্যাপার অতি সাংঘাতিক!

আমরা চারজনেই দারুণ ঘাবড়ে গিয়ে মাথা চুলকোতে লাগলুম। এখন কী করা যায়?

একটু পরে টেনিদা বললে—দা-দার্জিলিঙেই চলে যাব নাকি রে?

হাবুল বললে—হ, সেইডা মন্দ কথা না। বজ্রবাহাদুর গাড়ি নিয়া আসলেই—

ক্যাবলা চটে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠল—তোমাদের লজ্জা করে না? বিপদে পড়ে ভদ্রলোক ডেকে পাঠিয়েছিলেন, তাঁকে ডাকাতের হাতে ফেলে পালাবে? পটলডাঙার ছেলেরা এত কাপুরুষ? এর পরে কলকাতায় ফিরে মুখ দেখাবে কী করে?

হাবুল সেনের একটা গুণ আছে—সব সময়েট সকলের সংগে সে চমৎকার একমত হয়ে যেতে পারে। সে বললে—হ সত্য কইছ। মুখ ছ্যাখান যাইবো না।

আমি বললুম—কিন্তু সাঁতরা মশাইকে কোথায় পাওয়া যাবে? হয়তো এতক্ষণ তাঁকে কোন গুপ্তগৃহে—

—শাট আপ— গুপ্তগৃহ!—রাগের মাথায় ক্যাবলার মুখ দিয়ে হিন্দি বেরুতে লাগল—কেয়া, তুমলোগ মজাক কর রহে হো? বে-কোয়াশ বাত ছোড়ো। গুপ্তগৃহ অত সহজে মেলে না—ও শুধু ডিটেকটিভ বইতেই লেখা থাকে। চল—বাড়ির পেছনে পাইনের বনটা আগে একটু খুঁজে দেখি! তারপর যা হয় প্ল্যান করা যাবে!

টেনিদা মাথা চুলকে বললে—এক্ষুনি?

—এক্ষুনি।

টেনিদার খাঁড়ার মতো নাকের ডগাটা কেমন যেন বেঁটে হয়ে গেল—মানে একটু চা-টা না খেয়ে বেরুলে—কী বলে ঠিক গায়ের জোর পাওয়া যাবে না। খিদেও তো পেয়েছে—তাই—

ক্যাবলা বললে—এই কি তোমার খাবার সময়? শেম—শেম!

'শেম শেম' শুনেই আমাদের লিডার সংগে সংগে বুক টান করে দাঁড়িয়ে গেল। ঘরের একটা খুঁটি ধরে বার তিনেক বৈঠক দিয়ে টেনিদা বললে—অল রাইট! চল—এই মুহূর্তেই বেরিয়ে পড়া যাক।

কিন্তু কাঞ্ছা অতি সুবোধ বালক। সাতকড়ি লোপাট হয়ে গেছেন বটে, কিন্তু কাঞ্ছা নিজের ডিউটি ভুলে যায় নি। সে বললে—ব্রেকফাস্ট তৈরিই আছে বাবু। খেয়েই বেরোন।

ক্যাবলার দিকে আমরা ভয়ে ভয়ে তাকালুম। ক্যাবলা বললে—বেশ, তাহলে খেয়েই বেরুনো যাক। কিন্তু মাইণ্ড ইট—পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আমাদের বেরুতে হবে। আর এই প্যালাটা যে আধ ঘণ্টা ধরে বসে টোস্ট চিবুবে সেটা কিছুতেই চলবে না।

বা-রে যত দোষ সব আমার ঘাড়েই! আমার রাগ হয়ে গেল।



বললুম—আমিই বুঝি আধঘণ্টা ধরে টোস্ট চিবুই ? আর তুই যে কালকে একঘণ্টা ধরে মুরগির ঠ্যাং কামড়াচ্ছিলি, তার বেলায় ?

টেনিদা কড়াং করে আমার কানে জোর একটা চিমটি দিয়ে বললে —অ্যাই চোপ—বিপদের সময় নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করতে নেই।

আমি চেঁচিয়ে বললুম—খালি আমাকেই মারলে ? আর ক্যাবলা যে—

—ঠিক ! ও-ও বাদ যাবে না!—বলেই টেনিদা ক্যাবলাকে লক্ষ্য করে একটা রাম চাঁটি হাঁকড়াল। ক্যাবলা সুট করে সরে গেল, আর চাঁটিটা গিয়ে পড়ল হাবুলের মাথায়।

—খাইছে খাইছে ! বলে চেঁচিয়ে উঠল হাবুল। একেবারে ষাঁড়ের মতো গলায়।

॥ ১০ ॥

শত্রুর ভীষণ আক্রমণ

খেয়ে-দেয়ে আমরা বনের মধ্যে বেরিয়ে পড়লুম।

ঝাউবাংলোর ঠিক পেছনেই জঙ্গলটা! পাহাড়ের মাথার ওপর দিয়ে কতদূর পর্যন্ত চলে গেছে কে জানে! সারি সারি পাইনের গাছ, এখানে ওখানে টাইগার ফার্নের ঝোপ, বড়ো ধুতরোর মতো সানাই ফুল, পাহাড়ি ভুঁইচাঁপা। শাদায় কালোয় মেশানো সোয়ালোর ঝাঁক মধ্যে মধ্যে আশপাশ দিয়ে উড়ে যেতে লাগল তীর বেগে, কাকের মতো কালো কী পাখি লাফাতে লাফাতে বনের ভেতর অদৃশ্য হল, আর লতা-পাতা সোঁদা মাটি, ভিজে পাথরের ঠাণ্ডা গন্ধ—সব মিলিয়ে ভীষণ ভালো লাগল জংগলটাকে।

আমি ভাবছিলুম এই রকম মিষ্টি পাহাড় আর ঠাণ্ডা বনের ভেতর সন্নিসি টন্নিসি হয়ে থাকতে আমিও রাজি আছি, যদি দুবেলা বেশ ভালোমতন খাওয়া-দাওয়ার বন্দোবস্ত থাকে। সত্যি বলতে কি, আমার সকালবেলাটাকে ভীষণ ভালো লাগছিল, এমন কি সবুজ-দাড়ি, সাতকড়ি সাঁতরা, সেই হতচ্ছাড়া কাগামাছি, সেই মিচকে-পটাশ কদম্ব পাকড়াশি—সব মুছে গিয়েছিল মন থেকে। বেশ বুঝতে পারছিলুম, এই বনের মধ্যে ঘুরে বেড়ান বলেই সাতকড়ির মগজে কবিতা বিজ বিজ করতে থাকে:

ওগো পাইন,
ঝিলমিল করছে জ্যোৎস্না
দেখাচ্ছে কী ফাইন!

আমিও প্রায় কবি-কবি হয়ে যাচ্ছি, এমন সময় টেনিদা

বললে—দুৎ, এ-সবের কোনো মানেই হয় না। কোথায় খুঁজে বেড়াব বল দিকি বনের মধ্যে? আর তা ছাড়া সাতকড়িবাবুকে নিয়ে জংগলের দিকেই তারা গেছে তারও তো কোনো প্রমাণ নেই।

আমি বললুম—ঠিক। সামনে অত বড় রাস্তা থাকতে খামোকা জংগলেই বা ঢুকবে কেন?

ক্যাবলা বললে—প্রমাণ চাও? ওই দ্যাখো!

আরে তাই তো! একটা ঝোপের মাথায় রঙচঙে কী আটকে আছে ওটা? এক লাফে এগিয়ে গিয়ে সেটাকে পাকড়াও করল হাবুল।

এবং জিনিশটা আর কিছুই নয়। চকোলেটের মোড়ক! তাহলে নিশ্চয়—

আমি বললুম—কদম্ব পাকড়াশি!

হাবুল ঝোপের মধ্যে কী খুঁজছিল।

ক্যাবলা বললে—আর কিছু পেলি নাকি রে?

হাবুল বললে—না—পাই নাই। খুঁইজ্যা দেখতাছি। যদি চকোলেটখানাও এইখানে পইড়্যা থাকে, তাইলে জুত কইরা খাওন যাইবো।

—জুত করে আর খেতে হবে না! চলে আয়!—কড়া গলায় ডাকল ক্যাবলা।

ব্যাজার হয়ে হাবুল চলে এল। আর এর মধ্যেই আর একটা আবিষ্কার করল টেনিদা।

মোড়কটা পেছন দিকে শাদা কাগজের ওপর পেনসিল দিয়ে কী সব লেখা।

—এ আবার কী রে ক্যাবলা?

ক্যাবলা কাগজটা নিয়ে পড়তে লাগল। এবারেও একটা ছড়া।

সাঁতরা মশাই গুম
টাক ডুমাডুম ডুম।

বৃক্ষে ও কী লম্ব
বলছে শ্রীকদম্ব !

সেই কদম্ব পাকড়াশি ! সেই ধুশো মাফলার জড়ানো, সেই মিচকে হাসি ফিচকে লোকটা !

লেখা পড়ে আমরাও গুম হয়ে রইলুম। তারপর টেনিদা বললে—ক্যাবলা ?

ক্যাবলা গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে বললে—হুঁ !

—কী বুঝছিস ?

—এই জংগলের মধ্যেই তাহলে কোথাও ওরা আছে।

—কিন্তু কোথায় আছে ? আমি বললুম—জংগলের মধ্য দিয়ে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আমরা একেবারে সিকিম-ভুটান পার হয়ে যাব নাকি ?

ক্যাবলা আরো গম্ভীর হয়ে বললে—দরকার হলে তাও যেতে হবে।

—খাইছে ! হাবুলের আর্তনাদ শোনা গেল।

ক্যাবলা তাতে কান দিল না। ছড়াটা আর একবার নিজে নিজেই আউড়ে নিয়ে বললে—সাঁতরা মশাই গুম হয়েছেন এটা তো পরিষ্কার দেখাই যাচ্ছে।

—আর সেই জন্যে আনন্দে কাগামাছি আর কদম্ব বলছে টাক ডুমাডুম ! আমি ব্যাখ্যা করে দিলুম।

হাবুল বললে—কদম্ব সেই কথাই কইতে আছে।

ক্যাবলা ভুরু কোঁচকাল ; শার্টের পকেট থেকে একটা চুয়িংগাম মুখে পুরে চিবুতে চিবুতে বললে—এ-সব ঠিক আছে। কিন্তু বৃক্ষে ও কী লম্ব—এর মানে কী ? গাছে কী ঝুলছে ?

—গাছে কী ঝুলবো ? পাকা কাঁটাল ঝুলতে আছে বোধহয়।

শুনেই টেনিদা ভীষণ খুশি হয়ে উঠল !

—পাকা কাঁটাল ঝুলছে ? তাই নাকি ? কোথায় ঝুলছে রে ?

—তুমলোগ কেতনা বেফায়দা বাত কর রহে হো? —ক্যাবলা চেঁচিয়ে উঠল—খাওয়ার কথা শুনলেই তোমাদের কারু আর মাথা ঠিক থাকে না। পাইন বনের ভেতর পাকা কাঁটাল কোত্থেকে ঝুলছে? আর এই সময়? ওর একটা গভীর অর্থ আছে বলে আমার মনে হয়।

—কী অর্থ শুনি? —কাঁটাল না পেয়ে ব্যাজার হয়ে জিগগেস করল টেনিদা।

—একটু দেখতে হচ্ছে। চলো, এগোনো যাক।

বেশি দূর এগোবার দরকার হল না। এবারেও চেঁচিয়ে উঠল হাবুলই।

—ওই—ওইখানেই ঝুলতাছে।

—কী ঝুলছে? কী ঝুলছে?—আমরা আরো জোরে চিৎকার করলুম।

—দেখতে আছো না? ওই গাছটায়?

কী একটা পাহাড়ি গাছ। বেশি উঁচু নয়, কিন্তু অনেক ডালপালা আর তাতে বানর লাঠির মতো লম্বা লম্বা সব ফল রয়েছে। সেই গাছের মগডালে শাদা কাপড়ের একটা পুঁটলি।

আমরা খানিকক্ষণ হাঁ করে সেদিকে তাকিয়ে রইলুম। তারপর টেনিদা বললে—তাহলে ওটাই সেই বৃক্ষে লম্ব ব্যাপার।

ক্যাবলা বললে—হুঁ!

টেনিদা বললে—তাহলে ওটাকে তো পেড়ে আনতে হয়!

আমি ঘাবড়ে গিয়ে বললুম—দরকার কী টেনিদা—যা লম্ব হয়ে আছে তা ওই লম্বমান থাকুক না! ওটাকে নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করে কাজ নেই।

হাবুল বললে—হ, সত্য কইছস! কয়েকটা বোম্বা-টোম্বাই লম্ব কইরা রাখছে কি না কেডা কইবো? দুড়ুম কইর‍্যা ফাইট্যা গিয়া শ্যাষে আমাগো উড়াইয়া দিবো।

টেনিদা বললে—হুঁ—তা-ও অসম্ভব নয়!

ক্যাবলা বললে—ভিতুর ডিম সব! ছো ছো, এমনি কাওয়ার্ডের মতো তোমরা কাগামাছির সংগে মোকাবেলা করতে চাও! যাও—এক্ষুনি সবাই মুখে ঘোমটা টেনে দার্জিলিঙে পালিয়ে যাও।

টেনিদা মধ্যে মধ্যে বেগতিক দেখলে এক আধটু ঘাবড়ে যায় বটে, কিন্তু কাওয়ার্ড কথাটা শুনলেই সে সিংহের মতো লাফিয়ে ওঠে। আর আমি—পটলডাঙাব প্যালাবাম, এককালে যার কচি পটোল দিয়ে সিঙি মাছের ঝোলই নিত্য বরাদ্দ ছিল, আমার মনটাও সংগে সংগে সিংঙি মাছের মতো তড়পে ওঠে।

টেনিদা বললে—কী বললি! কাওয়ার্ড! ঠিক আছে, মরতে হয় তো আমিই মবব। যাচ্ছি গাছে উঠতে। শুনে আমার রবীন্দ্রনাথের কবিতা মনে পড়ে গেল ঃ

আগে কেবা প্রাণ করিবেক দান ইত্যাদি ইত্যাদি। আরো মনে হল, বীরেব মতো মরবার সুযোগ যদি এসেই থাকে আমিই বা ছাড়ব কেন? এগিয়ে গিয়ে বললুম—তুমি আমাদের লিডার—মানে সেনাপতি। প্রাণ দিতে হলে সৈনিকেরই দেওয়া উচিত! সেনাপতি মরবে কেন? আমিই গাছে উঠব।

ক্যাবলা বললে—শাবাস—শাবাস!

আর টেনিদা আর হাবুল মিলে দারুণ ক্ল্যাপ দিয়ে দিলে একখানা। ক্ল্যাপ পেয়ে ভীষণ উৎসাহ এসে গেল। আমি তড়াক করে গাছে চড়তে গেলুম। কিন্তু একটু উঠেই টের পেলুম, প্রাণ দেওয়াটা শক্ত কাজ নয়—তার চাইতে আরো কঠিন ব্যাপার আছে। মানে কাঠ পিঁপড়ে!

টেনিদা বললে—তাতে কী হয়েছে! বীরের মতো উঠে যা। আর নজরুলের মতো ভাবতে থাক; আমি ধূর্জটি—আমি ভীম ভাসমান মাইন!

কামড়ে ত্রিভুবন দেখিয়ে দিচ্ছে—এখন মাইন ফাইন কারুর

ভালো লাগে? দাঁত-টাঁত খিঁচিয়ে—মুখটাকে ঠিক ডিমের হালুয়ার মতো করে আমি গাছের ডগায় উঠে গেলুম।

সামনেই দেখছি কাপড়ের পুঁটলিটা। একবারের জন্য হাত কাঁপল বুকের ভেতরটা হাঁকপাঁক করে উঠল। যদি সত্যিই একটা বোমা বোমা ফাটে? যদি—কিন্তু ভেবে আর লাভ নেই। কবি লিখেছেন—মরতে হয় তো মর গো! আর যে রকম পিঁপড়ে কামড়াচ্ছে তাতে বোমার ঘায়ে মরাই ঢের বেশি সুখের বলে মনে হল এখন।

দিলুম হাত। ভেতরে কতগুলো কী সব রয়েছে। ফাটল না।

টেনিদা বললে,—টেনে নামা। তারপর নিচে ফেলে দে।

আমি দেখলুম, পুঁটলিটা আলগা করেই বাঁধা আছে, খুলতে সময় লাগল না, নিচে ওদের ডেকে বললুম—আমি ফেলছি, তোমরা সবাই সরে যাও! যদি ফাটে-টাটে—

ফেলে দিলুম, তারপরেই ভয়ে বন্ধ করলুম চোখ দুটো। পুঁটলিটা নিচে পড়ল কিন্তু কোনো অঘটন ঘটল না, কোনো বিস্ফোরণও হল না। তাকিয়ে দেখি ওরা গুটি-গুটি পুঁটলিটার দিকে এগিয়ে আসছে। কিন্তু গাছে আর থাকা যায় না—কাঠপিঁপড়েরা আমার ছাল-চামড়া তুলে নেবার প্ল্যান করেছে বলে মনে হল। আমি প্রাণপণে নামতে আরম্ভ করলুম।

আর নেমে দেখি—

ওরা সব থ হয়ে পুঁটলিটাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে। ওটা খোলা হয়েছে আর ওর ভেতরে—কাঁচকলা! স্রেফ চারটে কাঁচকলা! সাধুভাষায় যাকে তরুণ কদলী বলা যায়।

টেনিদা নাকটাকে ছানার জিলিপির মতো করে বললে—এর মানে কী? এত কাণ্ড করে চারটে কাঁচকলা!

ক্যাবলা মোটা গলায় বললে,—হুঁ, ঠিক চারটে! আমরাও চারজন। মানে, মাথাপিছু একটা করে!

হাবুল বললে—তাইলে আমাগো—

আর বলতে পারল না, তক্ষুনি ছটাং-ছটাং—

অদৃশ্য শত্রুর অস্ত্র ছুটে এল আমাদের দিকে। একটা পড়ল টেনিদার নাকে, আর একটা হাবুলের মাথায়। টেনিদা লাফিয়ে উঠল—ইঁ—ইঁ—ইঁ—

হাবুল হাউ হাউ করে বললে—খাইছে—খাইছে।

তা 'খাইছে খাইছে' ও বলতেই পারে! ছুটো সাংঘাতিক অস্ত্র—মানে পচা ডিম। পড়েই ভেঙেছে। টেনিদার মুখ আর হাবুলের মাথা বেয়ে নামছে বিকট দুর্গন্ধের স্রোত!

আমি কী বলতে যাচ্ছিলুম, সঙ্গে সঙ্গে আর একটা পচা ডিম এসে আমার পিঠেও পড়ল! আর একটা ক্যাবলার কান ঘেসে বোঁ করে বেরিয়ে গেল—একটুর জন্য লক্ষ্যভ্রষ্ট!

॥ ১১ ॥

ক্যাচ্—কট্—কট্

চারটে কাঁচকলার ধাক্কা যদি বা সামলানো গিয়েছিল, পচা ডিম আমাদের একেবারে বিধ্বস্ত করে দিলে! বিশেষ যে লেগেছিল তা নয়—কিন্তু তার কী খোশবু! সে গন্ধে আমি তুমি তো তুচ্ছ—স্বয়ং গন্ধরাজ ছুঁচোর পর্যন্ত দাঁতকপাটি লেগে যাবে!

হাবুল বললে—ইশ, দফাখান সাইরা দিছে একেবারে। অখনি গিয়া সাবান মাইখা চান করন লাগবো!

আমি মিষ্টি গলায় পিন্ পিন্ করে বললুম—আমার এমন ভালো কোটটাকে—

কথাটা শেষ হল না। তার আগেই ক্যাবলা বললে—টেনিদা, —উয়ো দেখ্‌খো!

ক্যাবলা অনেকদিন পশ্চিমে ছিল, চটে গেলে কিংবা খুশি হলে কিংবা উত্তেজিত হলে ওর গলা দিয়ে হিন্দি বেরুতে থাকে। পচা ডিমের গন্ধে টেনিদা তখন তিড়িং-মিড়িং করে লাফাচ্ছিল, দাঁত খিঁচিয়ে বললে—কী আবার দেখব র‍্যা? তোর কুবুদ্ধিতে পড়ে সেই জোচ্চোর কাগামাছিটার হাতে—

ক্যাবলা বললে—আরে জী, জেরা আঁখসে দেখো না। উধার—উয়ো পেড় কি পিছে।

টেনিদা থমকে গেল।

—আরে তাই তো! ওই গাছটার পেছনে কেউ লুকিয়ে আছে মনে হয়। ওই লোকটাই তাহলে ডিম ছুড়ে মেরেছে, নির্ঘাত! পীরের সংগে মামদোবাজি—বটে!

টেনিদা এমনিতে বেশ আছে, খাচ্ছে দাচ্ছে, আমাদের পকেটে হাত বুলিয়ে দিব্যি আলুকাবলি থেকে চপ কাটলেট পর্যন্ত চালিয়ে যাচ্ছে, কিছু বলতে গেলেই চাঁটি কিংবা গাঁট্টা বাগিয়ে তেড়ে আসছে। কিন্তু কাজের সময় একেবারে অন্য চেহারা—যাকে বলে সিংহ। তখনই আমাদের আসল লিডার। আমাদের পাড়ার ওদিকে গত বছর বস্তিতে আগুন ধরে গেল, ফায়ার ব্রিগেড পৌঁছুবার আগেই একটা বাচ্চাকে পাঁজাকোলা করে বেরিয়ে এল তিন লাফে! সাধে কি টেনিদাকে এত ভালোবাসি আমরা!

গাছের আড়ালে শত্রুকে দেখতে পেয়েই টেনিদা গায়ের কোটটাকে ছুড়ে ফেলল! বললে—হা-রে-রে-রে! আজ এক চড়ে কাগামাছির মুণ্ডু যদি কাটামুণ্ডুতে পৌঁছে না দিই তবে আমি টেনি মুখুজ্জেই নই।

বলেই 'ডি-লা গ্রাণ্ডি মেফিস্টোফিলিস' শব্দে এক রাম চিৎকার! তারপরেই এক লাফে ঝোপ-জংগল ভেঙে তীরের মতো গাছটার দিকে ছুটল। আমরা তিনজনে চোখগুলোকে গোল আলুর মতো করে চেয়ে রইলুম, 'ইয়াক ইয়াক' পর্যন্ত বলতে পারলুম না।

টেনিদাকে তীরের মতো ছুটতে দেখেই লোকটা ভোঁ-দৌড়। ঝোপজংগলের মধ্যে ভালো দেখা যাচ্ছিল না তবু যেন মনে হল, লোকটা যেন আমাদের অচেনা নয়, কোথায় ওকে দেখেছি।

বনের মধ্য দিয়ে ছুটল লোকটা। টেনিদা তার পেছনে। এক মিনিট পরেই আর কিছু দেখতে পেলুম না, শুধু দৌড়ানোর আওয়াজ আসতে লাগল। তারপরেই কে যেন ধপাস করে পড়ল, খানিকটা ঝটাপটির আওয়াজ আর টেনিদার চিৎকার কানে এল: হাবুল-প্যালা-ক্যাবলা, ক্যাচ-কট-কট। কুইক—কুইক!

ক্যাচ-কট-কট! তার মানে কাউকে ধরে ফেলেছে!

ডি-লা গ্র্যাণ্ডি মেফিস্টোফিলিস্ ইয়াক-ইয়াক! আমরা তিনজনে বোঁ-বোঁ করে ছুটলুম সেদিকে। পাহাড়ি উঁচু-নিচু রাস্তা, ছুটতে

গিয়ে নুড়িতে পা পিছলে যায়, ডান হাতে বিছুটির মতো কী লেগে জ্বালাও করতে লাগল, কিন্তু আর কি কোনোদিকে তাকাবার সময় আছে এখন! এক মিনিটের মধ্যেই টেনিদার কাছে পৌঁছে গেলুম আমরা।

দেখি, টেনিদা বসে আছে মাটিতে। তার এক হাতে একটা মেটে রঙের ধুশো মাফলার, আর এক হাতে দুটো চকোলেট। সামনে কতগুলো কাগজপত্র ছড়ানো!

আমরা কিছু বলবার আগেই টেনিদা করুণ গলায় বললে—ধরেছিলুম লোকটাকে, একদম জাপটে। কিন্তু দেখছিস তো পাথর কিরকম পেছল, স্লিপ করে পড়ে গেলুম। লোকটাও খানিকদূর কুমড়োর মতো গড়িয়ে উঠে ছুট লাগাল! এদিকে দেখি, একটা পা একটু মচকে গেছে—উঠে আর তাড়া করতে পারলুম না।

ক্যাবলা বললে—কিন্তু এগুলো কী?

—সেই হতচ্ছাড়া কাগামাছি না বগাহাঁচির পকেট থেকে পড়েছে। আর ধুশো মাফলারটা আমি কেড়ে নিয়েছি।—বলেই একটা চকোলেটের মোড়ক খুলে তার একটুকরো ভেঙে নির্বিকার-ভাবে মুখে পুরে দিলে!

ক্যাবলা বললে—দাঁড়াও—দাঁড়াও, চকোলেট খেয়ো একটু পরে। এই মাফলারটাকে চিনতে পারছ?

—চিনতে বয়ে গেছে আমার।—চকোলেট চিবোতে চিবোতে টেনিদা বললে—যেমন বিচ্ছিরি দেখতে, তেমনি তেল-চিটচিটে। বুঝলি, কাটামাছিটা বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক হলে কী হয়—লোকটার কোনো টেস্ট নেই, নইলে অমন একটা বোগাস মাফলার গলায় জড়িয়ে রাখে!

ক্যাবলা বললে—দুত্তোর।

টেনিদা বিরক্ত হয়ে বললে,—থাম!—'দুত্তোর দুত্তোর' করিস-নি। পায়ে ভীষণ ব্যথা করছে—কষ্ট হচ্ছে উঠে দাঁড়াতে। ওই

যাচ্ছেতাই মাফলারটা দিয়ে আমার বাঁ পা-টা একটু বেঁধে দে দিকিনি।

এতক্ষণ পরে হাবুল সেনের মাথাটা যেন সাফ হয়ে গেল একটুখানি। হাবুল বললে—হ-চিনছি তো। এই মাফলারটাই তো দেখছিলাম কদম্ব পাকড়াশির গলায়।

আমি বললুম—ঠিক—ঠিক।

টেনিদা বললে—তাই তো! আরে, এতক্ষণ তো খেয়াল হয় নি। সেই লোকটাই তো চকোলেট প্রেজেন্ট করে শিলিগুড়ি স্টেশনে আমাদের ঝাউবাংলোয় আসতে নেমন্তন্ন করেছিল। আর সে-ই তো কাগামাছির চীফ অ্যাসিস্ট্যান্ট—সাতকড়ি সাঁতরার কী সব মুলো-টুলো চুরি করবার জন্যে—

ক্যাবলা ততক্ষণে মাটিতে পড়া গোটা দুই কাগজ কুড়িয়ে নিয়েছে। আমি দেখলুম, দুখানাই ছাপা কাগজ---হ্যাণ্ডবিল মনে হল। তাতে লেখা আছে:

> **শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে!**
> **বিখ্যাত গোয়েন্দা লেখক**
> **পুণ্ডরীক কুণ্ডুর**
> **রহস্য উপন্যাস—??**
> **পাতায় পাতায় শিহর—ছত্রে ছত্রে রোমহর্ষণ!**
> **প্রকাশক:**
> **জগবন্ধু চাকলাদার অ্যাণ্ড কোং**
> **১৩নং হারাণ ঝম্পটি লেন, কলিকাতা-৭২**

ক্যাবলার সঙ্গে সঙ্গে আমি আর হাবুলও হ্যাণ্ডবিলটা পড়ছিলুম। ওদিকে টেনিদা তখন তেমনি নিশ্চিন্ত হয়ে চকোলেট চিবিয়ে চলেছে, বিশ্ব-সংসারের কোনো দিকে তার কোনো লক্ষ্য আছে বলে মনে হল না।

পড়া শেষ করে ক্যাবলা বললে—এর মানে কী ?

এইবার আমার পালা। ক্যাবলা ভারি বেরসিক ছেলে, ডিটেকটিভ বই-টই পড়ে না, বলে বোগাস্! হাবুলের সমস্ত মন পড়ে আছে ক্রিকেট খেলায়—সেও বিশেষ খবর-টবর রাখে না। কিন্তু আমি ? আমার সব কণ্ঠস্থ! রামহরি বটব্যালের ‘রক্তমাখা ছিন্নমুণ্ড’, ‘কঙ্কালের হুঙ্কার’, ‘নিশীথ রাতের চামচিকে’ থেকে শুরু করে যদুনন্দন আঢ্যের ‘কেউটে সাপের ল্যাজ’, ‘ভীমরুল বনাম জামরুল’, ‘অন্ধকারের কন্ধকাটা’—মানে বাংলা ভাষায় যেখানে যত গোয়েন্দা বই আছে—সব প্রায় মুখস্থ করে ফেলেছি। আর পুণ্ডরীক কুণ্ডু ? হ্যাঁ, তাঁর বইও আমি পড়েছি। তবে ভদ্রলোক সে-রকম জমিয়ে লিখতে পারেন না, দাঁড়াতেই পারেন না রামহরি কিংবা যদুনন্দনের পাশে। কিন্তু তাঁর ‘তক্তপোষের পোক্ত ছারপোকা’ আমার মন্দ লাগেনি। বিশেষ করে সেই বর্ণনাটা—যেখানে হত্যাকারীর তক্তপোষের নিচে গোয়েন্দা হীরক সেন একটা সেই মাইক্রোফোন লুকিয়ে ফিট করে রেখেছিলেন ; হত্যাকারী ঘুমের ঘোরে কথা কইত, আর দু'মাইল দূরে বসে গোয়েন্দা মাইক্রো-ফোনের সাহায্যে তার সব গোপন কথা শুনতে পেতেন।

দু-নম্বর কাগজটাও ওই একই হ্যাণ্ডবিল! ক্যাবলা সেটাও একবার পড়ে নিলে। তারপর আবার বললে,—এর মানে কী ? এই হ্যাণ্ডবিল কেন ? কে পুণ্ডরীক কুণ্ডু ? জগবন্ধু চাকলাদারই বা কে !

আমি বললুম—পুণ্ডরীক কুণ্ডু গোয়েন্দা বই লেখেন, কিন্তু ওঁর বই ভালো বিক্রি হয় না। আর জগবন্ধু চাকলাদার ওঁর পাবলিশার।

—হুঁ।

হাবুল ধুশো মাফলারটা নাড়াচাড়া করছিল, হঠাৎ ‘উঃ’ বলে চেঁচিয়ে উঠে মাফলারটা ফেলে দিলে আর প্রাণপণে হাত ঝাড়তে শুরু করে দিলে।

আমি চমকে উঠে বললুম—কী হল রে হাবলা? মাফলারের মধ্যে কি কোনো বিষাক্ত ইন্‌জেক্‌শন—

—আরে ফালাইয়া থো তোর বিষাক্ত ইন্‌জেক্‌শন! একটা লাল পিঁপড়া আছিল, একখান মোক্ষম কামড় মারছে।

আহত পিঁপড়েটা তখন মাটিতে পড়ে হাত-পা ছুড়ছিল। ক্যাবলা একবার সেদিকে তাকাল, তারপর আমার কোটের দিকে তাকিয়ে দেখল। কিছুক্ষণ কী ভাবল—মনে হল, কী যেন একটা গভীর রহস্যের সমাধান করবার চেষ্টা করছে।

তারপর বললে—তোর কোটেও তো দেখছি কয়েকটা মরা পিঁপড়ে লেগে আছে প্যালা!

বললুম—বাঃ! গাছে উঠে ওদের সংগেই তো আমাকে ঘোরতর যুদ্ধ করতে হচ্ছিল।

—হুঁ। আচ্ছা, ভালো করে চারদিকের ঝোপজঙ্গল লক্ষ করে দেখ তো, এরকম পিঁপড়ে এখানে আছে কিনা!

এতক্ষণ পরে টেনিদা বললে—কী পাগলামো হচ্ছে ক্যাবলা। কাগামাছিকে ছেড়ে শেষে পিঁপড়ে নিয়ে গোয়েন্দাগিরি করবি নাকি? উঃ, কদম্বটাকে ঠিক জাপটে ধরেছিলুম—একটুর জন্যে—

ক্যাবলা বললে—একটু থামো দিকি। কদম্ব আর পালাতে পারবে না, ঠিক ধরা পড়বে এবার। কিরে হাবুল, প্যালা, আর লাল পিঁপড়ে পেলি এখানে?

হাবুল বললে—না, আর দেখতে আছি না।

বলতে বলতে হাবুলের পিঠ থেকে কী একটা ঝোপের ওপর পড়ল। দেখলুম, সেই পচা ডিমের খোলার একটুকরো।

হাওয়ায় সেটা উড়ে যাচ্ছিল, কিন্তু ক্যাবলা হঠাৎ লাফিয়ে উঠে সেটাকে ধরে ফেলল। একমনে কী যেন দেখেই সেটাকে রুমালে জড়িয়ে বুক পকেটে পুরে ফেলল।

টেনিদা বললে—ও আবার কিরে! পচা ডিমের গন্ধে প্রাণ

যাচ্ছে—গিয়ে জামা কাপড় ছাড়তে পারলে বাঁচি, তুই আবার সেই ডিমের খোলা কুড়িয়ে নিচ্ছিস !

ক্যাবলা সে কথার জবাব দিলে না। বললে—টেনিদা, উঠতে পারবে ?

—পারব মনে হচ্ছে। ব্যথাটা কমেছে একটুখানি।

—তবে চলো। আর দেরি নয়।

—কোথায় যেতে হবে ?

—ঝাউবাংলোয়। এক্ষুনি।

—আর সাঁতরা মশায় ? যদি তেনারে এর মইধ্যে কাগামাছি একেবারে লোপাট্ কইর‍্যা ফ্যালায় ?—হাবুল সন্দিগ্ধ হয়ে জানতে চাইল।

—আরে, কাগামাছি কো বাত আভি ছোড় দো। আগে ঝাউ-বাংলোয় চলো। সব ব্যাপারগুলোরই একটা ক্লু পাওয়া যাচ্ছে মনে হয়—শুধু একটুখানি বাকি। সেটা মেলাতে পারলেই—

আর তখুনি একটা কথা আমার মনে পড়ল। বড়ো বড়ো লেখকের অটোগ্রাফ জোগাড় করবার বাতিক আছে আমার, সেই সুবাদে আমি বছর তিনেক আগে একবার পুণ্ডরীক কুণ্ডুর শালকিয়ার বাড়িতে গিয়েছিলুম। একটা জলচৌকির ওপর উবু হয়ে বসে পুণ্ডরীক তামাক খাচ্ছিলেন, গলায় একটা ঢোলের মতো মস্ত মাদুলি দুলছিল ! ছবিটা চোখের সামনে এখনো জ্বলজ্বল করছে। গোয়েন্দা গল্পের লেখক, অথচ শার্লক হোম্‌সের মতো পাইপ খান না —বসে বসে হুঁকো টানেন আর তাঁর গলায় ঘামের নীল্‌চে রং-ধরা একটা পেতলের মস্ত মাদুলি থাকে, এটা আমার একেবারেই ভালো লাগেনি। কিন্তু সবটা আমার এখন নতুন করে মনে জাগল, আর সেই সঙ্গে—

আমার মগজের ভেতরে হঠাৎ যেন বুদ্ধির একটা জট খুলে গেল। তা হলে—তা হলে—

আমি তখুনি ক্যাবলার কানে কানে কথাটা বলে ফেললুম।

আর ক্যাবলা? মাটি থেকে একেবারে তিন হাত লাফিয়ে উঠল। আকাশ ফাটিয়ে আর্কিমিডিসের মতো চিৎকার করল—পেয়েছি—পেয়েছি!

—কী পেয়েছিস?—হাবুলের কাঁধে ভর দিয়ে আস্তে আস্তে হাঁটছিল টেনিদা, চমকে দাঁড়িয়ে পড়ল—কী পেলি—হাতি না ঘোড়া? খামোকা চেঁচাচ্ছিস কেন ষাঁড়ের মতো?

ক্যাবলা বললে—যা পাবার সব পেয়েছি। একেবারে দুইয়ে দুইয়ে চার—চারে চারে আট!

—মানে?

—সব জানতে পারবে পনেরো মিনিটের মধ্যেই। কিন্তু তার আগে প্যালাকেও কন্‌গ্র্যাচুলেট করা দরকার। ওর ডিটেক্‌টিভ বই পড়ারও একটা লাভ আছে দেখা যাচ্ছে। কলকাতায় ফিরেই ওকে আমি চাচার হোটেলের গরম গরম কাটলেট খাইয়ে দেব।

টেনিদা বললে—উহু উঁহু, মারা যাবে। ওর ওসব পেটে সইবে না। ওর হয়ে আমিই বরং ডবল খেয়ে দেব।

হাবুল মাথা নেড়ে বললে—সত্য কথা কইছ। আমিও তোমারে হেল্‌প করুম। কী কস্‌ প্যালা?

আমি মুখটাকে গাজরের হালুয়ার মতো করে চলতে লাগলুম। এ-সব তুচ্ছ কথায় কর্ণপাত করতে নেই।



॥ ১২ ॥

পুণ্ডরীক কুণ্ডু এবং রহস্যভেদ

ঝাউবাংলোর কাছাকাছি এসে পৌঁছুতেই একটা কাণ্ড ঘটে গেল। সামনে বাগানের ভেতর কাঞ্চা যেন কী করছিল—আমাদের ফিরে আসতে দেখেই থ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপরেই ভেতর দিকে টেনে দৌড়।

টেনিদা বললে—ও কি! আমাদের দেখেই কাঞ্চা অমন করে পালাল কেন!

ক্যাবলা বললে—পালাল না, খবর দিতে গেল!

—কাকে?

ক্যাবলা হেসে বললে—কাগামাছিকে।

হাবুল দারুণ চমকে উঠল।

—আরে, কইতে আছো কি! কাঞ্চা কাগামাছির দলের লোক?

—হুঁ। টেনিদা বললে—আর কাগামাছি লুকিয়ে আছে এই বাড়িতেই?

ক্যাবলা হেসে বললে—হ্যাঁ, সবাই আছে এখানে। কাগামাছি, বগাহাঁচি, দুধের চাঁছি—কেউ বাদ নেই।

টেনিদা গম্ভীর হয়ে বললে—ঠাট্টা নয় ক্যাবলা। ওরা যদি আমাদের আক্রমণ করে?

—কী নিয়ে আক্রমণ করবে? ওদের সম্পত্তির মধ্যে তো একটা ভাঙা হুঁকো, একগাছা মুড়ো ঝাঁটা আর একপাটি কুকুরে চিবুনো ছেঁড়া চটি। সে আক্রমণ আমরা প্রতিরোধ করতে পারব।

—ইয়ার্কি করছিস না তো ?

—একদম না। চলেই এসো না আমার সঙ্গে।

আমরা সিঁড়ি বেয়ে ঝাউবাংলোর দোতলায় উঠে গেলুম। বাড়িতে কোথাও কেউ আছে বলে মনে হয় না। চারদিক একেবারে নিঝুম! কাঞ্ছা পর্যন্ত কোথায় যেন হাওয়া হয়ে গেছে। টেনিদা খোঁড়াচ্ছিল বটে, তবু সেই ফাঁকেই এক কোনা থেকে একটুকরো ভাঙা কাঠ কুড়িয়ে নিলে।

আমি জিগগেস করলুম—ওটা দিয়ে কী হবে টেনিদা ?

—ঝাঁটা আর হুঁকোর আক্রমণ ঠেকানো যাবে।

ক্যাবলা বললে—কিচ্ছু দরকার নেই। অনেক বড়ো অস্ত্র আছে আমার কাছে। এসো সবাই—

কী যে ঘটতে যাচ্ছে ক্যাবলাই শুধু তা বলতে পারে। আমি মনে মনে খানিকটা আন্দাজ করছি বটে, কিন্তু এখনো পুরোটা ধরতে পারছি না। দুরু দুরু বুকে ক্যাবলার পেছনে পেছনে চললুম আমরা। এন্তার গোয়েন্দা বই পড়েছি আমরা, রামগড়ের সেই বাড়িতে আর ডুয়ার্সের জঙ্গলে এর মধ্যে আমাদের দু-দুটো অভিযানও আমাদের হয়ে গেছে, কিন্তু এবার যেন সবটাই কেমন বিদ্‌ঘুটে লাগছিল। আর সাতকড়ি—

নিশ্চয় সেই লোক! এখন আর আমার কোনো সন্দেহ নেই। আর ওই হ্যাণ্ডবিলটা—

ক্যাবলা বললে—এখানে।

দেখলুম, সেই বন্ধ ঘরটার সামনে আমরা দাঁড়িয়ে আছি। যেটায় দু-দুটো পেল্লায় তালা লাগানো! সাতকড়ি যাকে বলেছিলেন স্ট্যাক্‌রুম—মানে যার ভেতর বাড়ির সব পুরোনো জিনিসপত্র ডাঁই করে রাখা হয়েছে।

ক্যাবলা বললে—এই ঘর খুলতে হবে।

টেনিদা আশ্চর্য হয়ে বললে—এই ঘর? হাতি আনতে হবে

তালা ভাঙবার জন্যে, আমাদের কাজ নয়।

ক্যাবলা মরিয়া হয়ে বললে—চারজনে মিলে ধাক্কা লাগানো যাক। তালা না খোলে, দরজা ভেঙে ফেলব।

ভাবছি, চারজনে মিলে চার বছর 'মারো জোয়ান—হেঁইয়ো'—বলে ধাক্কা লাগালেও খোলা সম্ভব হবে কিনা, এমন সময় কোত্থেকে নেহাত ভালো মানুষের মতো গুটি-গুটি কাঞ্ছা এসে হাজির। যেন কিছুই জানে না, এমনি মুখ করে বললে—চা খাবেন বাবুরা? করে দেব?

তক্ষুনি তার দিকে ফিরল ক্যাবলা। বললে—চা দরকার নেই. এই ঘরের চাবিটা বার করো দেখি।

—চাবি? কাঞ্ছা আকাশ থেকে পড়ল!—চাবি তো আমি জানি না।

ক্যাবলা গম্ভীর হয়ে বললে—মিথ্যে কথা বোলো না কাঞ্ছা, ওতে পাপ হয়। চাবি তোমার প্যান্টের পকেটেই আছে। সুড়সুড় করে বের করে ফেলো।

পাপ-টাপের কথা শুনে কাঞ্ছা একটু ঘাবড়ে গেল। মাথা-টাথা চুলকে বললে—জু। চাবি আমার কাছেই আছে তা ঠিক। কিন্তু মনিবের হুকুম নেই—দিতে পারব না।

—তোমাকে দিতেই হবে।

কাঞ্ছা শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে গেল।—না, দেব না।

ক্যাবলা বললে—টেনিদা, কাঞ্ছা নেপালির ছেলে, জান দিয়ে দেবে, কিন্তু মনিবের বেইমানি করবে না। কাজেই চাবি ও কিছুতেই দেবে না। অথচ, চাবিটা আমাদের চাই-ই। তুমি যদি পায়ের মচকানিতে খুব কাতর না হয়ে থাকো—তা হলে—

ব্যাস, ওইটুকুই যথেষ্ট। টেনিদাকে আর উস্‌কে দেবার দরকার হল না। 'ডি-লা-গ্রাণ্ডি' বলেই তক্ষুনি ধপাং করে চেপে ধরল কাঞ্ছাকে, আর পরক্ষণেই কাঞ্ছার প্যান্টের পকেট থেকে বেরিয়ে এল

চাবির গোছা।

কাঙ্খা চাবিটা কেড়ে নিতে চেষ্টা করল—নির্ঘাত একটা দারুণ মারামারি হয়ে যাবে এবার, এই রকম আমার মনে হল। কিন্তু সে বিচ্ছিরি ব্যাপারটা থেমে গেল তক্ষুনি। কোথা থেকে আকাশ-বাণীর মতো মোটা গম্ভীর গলা শোনা গেল—কাঙ্খা, চাবি দিয়ে দাও, গোলমাল করো না।

চারজনেই থমকে গেলুম আমরা। কে বললে কথাটা? কাউকেই তো দেখা যাচ্ছে না।

আবার সেই গম্ভীর গলা ভেসে এল—লম্বা পেতলের চাবি দুটো লাগাও। তা হলে বেশি পরিশ্রম করতে হবে না।

এবার আর বুঝতে বাকি রইল না।

হাবুল রোমাঞ্চিত হয়ে বললে – আরে, সাঁতরা মশাইয়ের গলা শুনতাছি যে।

টেনিদা নাকটাকে কুঁচকে সরভাজার মতো বললে—মনে হচ্ছে যেন বন্ধ ঘরটার ভেতর থেকেই।

ততক্ষণে বিদ্যুৎ বেগে তালা দুটো খুলে ফেলেছে ক্যাবলা। দরজায় এক ধাক্কা দিতেই—

কে বলে স্টাক্‌রুম! খাসা একখানা ঘর। সোফা রয়েছে, খাটে ধবধবে বিছানা। ও পাশে যেদিকে আমাদের শোবার ঘর সেদিকের বন্ধ দরজাটার মুখোমুখি ছোট একটা প্রজেক্‌টার! আর—আর সোফায় যিনি বসে আছেন তিনি সাতকড়ি সাঁতরা স্বয়ং! একদৃষ্টিতে চেয়ে আছেন আমাদের দিকে।

ক্যাবলা বললে—নমস্কার পুণ্ডরীক বাবু। দাড়িটা খুলুন।

বিনা বাক্যব্যয়ে সাতকড়ি একটানে নকল সবুজ দাড়িটা খুলে ফেললেন। আর আমি পরিষ্কার দেখতে পেলুম সেই ভদ্রলোককেই—তিন বছর আগে যাঁর শালকিয়ার বাড়িতে অটোগ্রাফ আনতে গিয়েছিলুম আর যিনি উবু হয়ে মোড়ার ওপর বসে বসে তামাক

টানছিলেন।

টেনিদা আর হাবুল একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল।

--আরে!—আরে!

—এইটা আবার কিরে মশয়!

ক্যাবলা বললে—তোমরা চুপ করো। এক্ষুনি সব বুঝতে পারবে। কুণ্ডুমশাই!

গম্ভীর হয়ে সাতকড়ি বললেন—বলে ফেলো।

—আপনার সোফার পেছনে যিনি লুকিয়ে আছেন আর ঢুকেই যাঁর নাকটা আমি একটুখানি দেখতে পেয়েছি, উনিই বোধহয় জগবন্ধু চাকলাদার?

সাতকড়ি—না, না, পুণ্ডরীক কুণ্ডু, ওরফে কুণ্ডু মশাই, বললেন—ঠিক ধরেছ! তোমাদের বুদ্ধি আছে। ও জগবন্ধুই বটে।

—সোফার পেছনে ঘাপটি মেরে বসে উনি মিথ্যেই কষ্ট পাচ্ছেন। ওঁকে বেরিয়ে আসতে বলুন।

পুণ্ডরীক ডাকলেন—বেরোও হে জগবন্ধু।

জগবন্ধু সোফার পেছনে দাঁড়িয়ে উঠল। সেই মিচকে-গোঁফ ফিচকে চেহারা—শুধু গলার মেটে রঙের বিটকেল মাফলারটাই বেহাত হয়ে গেছে। কেমন বোকার মতো চেয়ে রইল আমাদের দিকে। এখন একদম নিরীহ বেচারা, যেন জীবনে কোনোদিন ভাজা মাছটিও উলটে খায়নি!

সাতকড়ি বললে—বসে পড়ো হে ছোকরারা, বসে পড়ো। ওরে কাঞ্চা, আমাদের জন্য ভালো করে চা আন। আচ্ছা এখন বলো দেখি, ধরে ফেললে কী করে?

ক্যাবলা বললে—এক নম্বর আপনার পাইন বনের কবিতা আর কদম্ব পাকড়াশির ছড়া। আপনার কবিতা শুনেই মনে হয়েছিল, ছড়াগুলোর সঙ্গে এর যোগ আছে।

—হুঁ। তারপর?

—দু নম্বর আপনার অদ্ভুত ফরমুলা। বাড়িতে একখানা সায়েন্সের বই নেই, আছে একগাদা ডিটেক্‌টিভ ম্যাগাজিন—অথচ আপনি সায়েন্টিস্‌ট্‌? আর ধাঁ করে আপনি থিয়োরি অব রিলেটিভিটির সঙ্গে জোয়ানের আরক মিলিয়ে দিলেন? আমরা অন্তত কলেজে পড়ি, এত বোকা আমাদের ঠাওরালেন কী করে? তখনি মনে হল, আপনি আমাদের নিয়ে মজা করতে চান—কাগামাছি-টাছি সব বানানো।

—বলে যাও।

—কত বলব? জগবন্ধুবাবুকে দিয়ে দার্জিলিঙে সিঞ্চলে আমাদের ছবি তুললেন সিনে ক্যামেরায়, পাশের ঘর থেকে প্রজেকটার ফেলে ছবি দেখালেন, কাণ্ডা না জগবন্ধু কাকে দিয়ে হাঁড়িচাচার ডাক শোনালেন—কাগজের মুণ্ডু নাচালেন—

জগবন্ধু এইবার ব্যাজার গলায় বললে—হাঁড়িচাচার ডাক আমি ডেকেছিলুম। কিন্তু তোমরাই বা মাঝরাতে আমার মাথায় জল ঢাললে কী বলে—হ্যা? এখনো সর্দিতে আমার মাথা ভার, নাক দিয়ে জল পড়ছে।

ক্যাবলা বললে—তবু আপনার ভাগ্যি ভালো যে ইট ফেলিনি। মাঝরাত্তিরে লোককে ঘুমুতে দেবেন না—ভেবেছেন কী? তারপর শুনুন কুণ্ডু মশাই। জগবন্ধুবাবুর ধুশো মাফলারটা টেনিদা কেড়ে নিয়েছিল—তা থেকে একটা লাল পিঁপড়ে হাবুলকে কামড়ে দিয়েছে। তখনই বোঝা গেল, গাছে উঠে কাঁচকলা বেঁধেছিল কে! তারপরে পচা ডিম। কিন্তু এই দেখুন—পকেট থেকে হাবুলের পিঠে লেগে থাকা সেই ভাঙা ডিমের খোলাটা বের করে হাবুল বললে—দেখুন, এতে এখনো বেগুনে পেন্সিলে লেখা নম্বর পড়া যায়—৩২। আপনার রান্নাঘরে ডিমের গায়ে এমনি নম্বর দেওয়া আছে সে আমি আগেই লক্ষ করেছি।

পুণ্ডরীক বললে—শাবাস্‌। আমি গোয়েন্দা গল্প লিখে থাকি,

তোমরা আমার শ্রেষ্ঠ গোয়েন্দা হীরক সেনকেও টেক্কা দিয়েছ। কিন্তু আমাদের পরিচয় পেলে কী করে ?

ক্যাবলা বললে—এটা ভুলে যাচ্ছেন কেন, আপনারা সাহিত্যিক। সবুজ দাড়ি লাগালেও ভক্তরা আপনাদের চিনতে পারে—যেমন প্যালা চিনে নিয়েছে। তা ছাড়া এই দেখুন হ্যাণ্ডবিল—টেনিদা যখন জগবন্ধুকে চেপে ধরেছিল, তখন ওঁর পকেট থেকে পড়ে গিয়েছিল। আর জানতে কী বাকি থাকে।

পুণ্ডরীক আর জগবন্ধু তুজনেই হাঁড়ির মতো মুখ করে চুপ করে রইলেন।

ক্যাবলা বলল—এবার বলুন, আমাদের সঙ্গে এ ব্যবহারের মানে কী ?

শুনে খ্যাঁচ-খ্যাঁচ করে উঠলেন কুণ্ডুমশাই।

—এত বুঝেছ, আর এটুকু মাথায় ঢুকল না ? আমার বই ভালো বিক্রি হচ্ছে না—আমি আর জগবন্ধু তুজনেরই মন মেজাজ খারাপ। বিলিতি বই থেকে টুকতে যাব, দেখি আমার আগেই যতুনন্দন আঢ্য আর রামহরি বটব্যাল সব মেরে দিয়ে বসে আছে। প্লট ভাববার জন্যেই এখানে এসেছিলুম। জগবন্ধুও আসছিল আমার এইখানেই, পথে তোমাদের সঙ্গে দেখা। দেখে ওর মাথায় মতলব খেলে যায়—তোমাদের কাজে লাগিয়ে একটা সত্যিকারের গোয়েন্দা গল্প বানালে কেমন হয় ? একটা কথা বলি—কবিতা-টবিতা আমার একদম আসে না। জগবন্ধু পাবলিশার হলে কী হয়, মনে মনে ও দারুণ কবি, ওগো পাইনটাও ওরই লেখা। ওই ছড়া লিখে তোমাদের ঘাবড়ে দেয়—আমাকে সবুজ দাড়ি পরায়, সব প্ল্যান করে তক্কে থেকে আমরা তোমাদের সঙ্গে টাইগার হিলে আর সিঞ্চলে যাই, জগবন্ধু ছবি তোলে আর ছুঁচোবাজি ছাড়ে—তারপর—তারপর তো দেখতেই পাচ্ছ। কিন্তু তোমরা সব ভণ্ডুল করে দিলে হে। আর একটু জমাতে পারলে আমার তুর্দান্ত একটা

ডিটেকটিভ বই তৈরি হয়ে যেত ! কুণ্ডমশাই দীর্ঘশ্বাস ফেললেন :

—আর সত্যজিৎ রায় মশাইকে ধরে-টরে যদি সেটাকে ফিল্‌ম্ করা যেত-—

ক্যাবলা চটে বললে—সত্যজিৎ রায় ওসব বাজে গল্প ফিলিম করেন না। সে যাক—পচা ডিম ছুড়ে যে আমাদের জামা-টামা খারাপ করে দিলেন, ধোওয়াবার খরচা এখন কে দেবে ?

কুণ্ডুমশাই আবার দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন—আমিই দেব। ওহে জগবন্ধু, একখানা চকোলেট বার করো দেখি, খেয়ে মনটা ভালো করি।

জগবন্ধু বললে—চকোলেট কোথায় স্যার ? পকেটে যা ছিল এরাই তো মেরে দিয়েছে।

তারপর ?

তারপব আবার কী থাকবে ? দুপুরে বজ্রবাহাদুর গাড়ি নিয়ে এল পুবং থেকে। আমরা সেই গাড়িতে চেপে তার ওখানে বেড়াতে গেলুম—তার বাড়িতে খুব খাওয়া-দাওয়া হল। তার নাম আর ভাবভঙ্গি যেমনই হোক, সে ভীষণ ভালো লোক—কত যে আদর-যত্ন করলে সে আর কী বলব ! তারপর সন্ধ্যেবেলায় তারই মোটরে দার্জিলিঙে ফিরে এলুম। সেই স্যানিটারিয়ামে।

কিন্তু আমাদের বোঝা বানিয়ে পুণ্ডরীক কুণ্ডু গোয়েন্দা গল্প লিখবেন, তা-ও কি হতে পারে ? তাই তিনি তাঁর উপন্যাস ছাপবার আগেই সব ব্যাপারটা আমি 'সন্দেশে' ছেপে দিলুম। তারপরেও যদি কুণ্ডুমশাই বইটা লিখে ফেলেন, তা হলে আমি তাঁর নামে গল্প চুরির মোকদ্দমা করব।

আর তোমরাও তখন আমার পক্ষেই সাক্ষী দেবে নিশ্চয় !

॥ খেল খতম্ ॥